بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-40

বাৎসরিক সাবৃসক্রিপশন ৬০০ টাকা

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 1 Oct, 2026 19 রবিউল সানি 1448 A.H

মহান আলস্নাহ্‌র বাণী
নামায মন্দ হইতে বিরত রাখে

اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ ؕ وَلَذِکۡرُ اللّٰہِ اَکۡبَرُ ؕ وَاللّٰہُ یَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُوۡنَ ﴿۴۶﴾

অনুবাদ: এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকম হইতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

[সুরা আনকাবুত: ৪৬]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রসুলের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই প্রকৃত জীবন

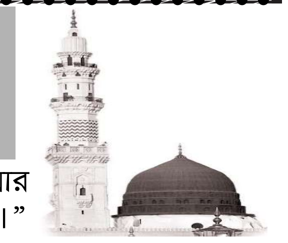

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ (سورة الأنفال آية :25)" ثُمَّ قَالَ: " لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ"، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ، فَذَكَرْتُ لَهُ، وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصًا، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا، وَقَالَ: هِيَ" الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحة:2) السَّبْعُ الْمَثَانِي".

[صحيح البخاری/ کتاب تفسير القرآن/حديث: 4647]

হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি নামাজ পড়ছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে পারিনি; বরং নামাজ শেষ করার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আসতে দেরি হলো কেন? আল্লাহ্‌তাআলা কি তোমাদের নির্দেশ দেননি-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের জীবন দান করে।"

অতঃপর তিনি বললেন, "মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব।"

কিছুক্ষণ পর তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলে আমি তাঁকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। আর মুআয ইবনে মুআয আনবারী এই হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের কাছে শু'বা বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে হুবায়ব বর্ণনা করেছেন, তিনি হাফসের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তিনি মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এর কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, সেটি হলো সূরা ফাতিহা-"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক-যার মধ্যে সাতটি আয়াত রয়েছে এবং যা প্রত্যেক নামাজে বারবার পাঠ করা হয়।

ব্যাখ্যা: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ :এই আয়াতে "লিমা ইউহিকুম-এর অর্থ হলো: "যে বিষয় তোমাদের সংশোধন করে।" "ইহইয়া"শব্দের অর্থ সংশোধন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের কথা মেনে চলো, কারণ তাঁরা এমন বিষয়ের দিকে পথনির্দেশ করেন, যার মাধ্যমে তোমাদের সংশোধন হবে। সূরা আলে ইমরানের তাফসিরের ১২ নম্বর অধ্যায়েও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

[সুনান তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল জিহাদ, হাদীস-১৬২১]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মহানবী (সা.)-এর মহান নিদর্শন

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"অনুরূপভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি মু'জিযা, অর্থাৎ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, সেই একই ঐশী শক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এর সঙ্গে কোনো দোয়া সম্পৃক্ত ছিল না; কারণ ঐশী শক্তিতে পরিপূর্ণ তাঁর আঙুলের ইঙ্গিতের মাধ্যমেই তা সংঘটিত হয়েছিল।

এ ধরনের আরও বহু মু'জিযা রয়েছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন এবং সেগুলোর সঙ্গে কোনো দোয়া ছিল না। বহুবার সামান্য পরিমাণ পানি, যা মাত্র একটি পেয়ালায় ছিল, তিনি সেই পানির মধ্যে নিজের আঙুল প্রবেশ করানোর মাধ্যমে এত পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে, সমগ্র সৈন্যদল এবং উট ও ঘোড়াগুলো সেই পানি পান করেছিল; এরপরও সেই পানি তার পূর্বের পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল।

আবার বহুবার দুই-চারটি রুটির ওপর হাত রেখে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষকে তা দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কখনো কখনো অল্প পরিমাণ দুধকে নিজের ঠোঁটের মাধ্যমে বরকত দিয়ে এমন করেছিলেন যে, তা দিয়ে একটি জামাতের পেট পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আবার কখনো লবণাক্ত কূপের পানিতে নিজের মুখের লালা দিয়ে সেটিকে অত্যন্ত মিষ্টি করে দিয়েছিলেন।

কখনো প্রচণ্ড ভাবে আহত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হাত রেখে তাদের সুস্থ করে দিয়েছিলেন। আবার কখনো এমন চোখ, যার চোখের গোলক যুদ্ধের কোনো আঘাতের কারণে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, নিজের হাতের বরকতের মাধ্যমে তা পুনরায় ঠিক করে দিয়েছিলেন।

এভাবেই আরও বহু কাজ তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার মাধ্যমে সম্পাদন করেছিলেন, যার সঙ্গে একটি গুপ্ত ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।"

(আয়না-ই কামালাত-ই ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬)

তফসীরে কবীর

মৃতদের জীবিত করার অর্থ-যারা মৃতদের মতো, তাদের জীবিত করে দেওয়া।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى -এই আয়াতে "মৃতদের পুনজীবন"-এর তাফসিরে বলেন:

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى'-এর দুটি অর্থ রয়েছে।

প্রথম অর্থ হলো, এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের জীবিত করেন; অর্থাৎ প্রকৃত মৃতদের জীবিত করে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন। এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত এই অর্থের বিরোধী এবং সেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মৃতরা এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না।

এই আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে-যারা মৃতদের মতো, তাদের জীবিত করে দেওয়া। এই অর্থ সাধারণ প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময় একটি বস্তু বা ব্যক্তি অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে এমনভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায় যে, তার নামও তার ওপর প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সাধারণ কথাবার্তায় কোনো ব্যক্তি যখন কঠিন আঘাত পায়, তখন সে নিজের ব্যথা ও কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, 'হায়! আমি মরে গেলাম।' এর অর্থ হলো, আমি মৃতদের মতো হয়ে গেছি।

সুতরাং আয়াতটির এই অর্থও হতে পারে যে, যারা মৃতদের মতো, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জীবিত করে দেন। অর্থাৎ যাদের বেঁচে থাকার কোনো আশাই অবশিষ্ট থাকে না এবং জাগতিক জ্ঞান তাদের ধ্বংসের রায় দিয়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদের রক্ষা করেন।"

[তাফসিরে কবীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৮, অনলাইন সংস্করণ]

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

আলস্নাহ্‌তাআলা কল্যাণ ও সফলতার জন্য তাকওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন

আমিরুল মুমিনিন হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস, (আই.) তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের ৬০তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধন করেন।

২০২৬ সালের যুক্তরাজ্য বার্ষিক জলসায় হুযুর আনওয়ার (আই.)-এর উদ্বোধনী ভাষণের সারাংশ

তাশাহহুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযুর আনওয়ার(আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, জলসার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"আমরা এই জলসা এ জন্য আয়োজন করছি, যাতে আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার ভয় সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরহেযগারি, তাকওয়া, আল্লাহ্‌ ভীতি ও সংযম, কোমল হৃদয় এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে একে অপরের জন্য আদর্শ হয়ে উঠি।"

অতএব, এই উদ্দেশ্যেই এসব জলসার আয়োজন করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই আজ আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন।

এ কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমরা যদি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা না করি, তাহলে আমাদের হযরত মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এর হাতে বয়আত গ্রহণ করাও উদ্দেশ্যহীন এবং এসব জলসায় অংশগ্রহণ করাও উদ্দেশ্যহীন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। যদি তাকওয়া থাকে, তাহলে মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার প্রদত্ত শিক্ষার ওপর আমল করতে পারে; অন্যথায় দ্বীনের ওপর আমল করার আমাদের দাবি কেবল একটি দাবিই হয়ে থাকবে।

হযরত মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, একটি কবিতার পংক্তিতে এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"প্রত্যেক নেক কাজের মূল এই তাকওয়া,
এই মূলটি থাকলে সর্বকিছুই অবশিষ্ট থাকে।"

এই দ্বিতীয় পংক্তিটি আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে প্রত্যাদেশ করেছিলেন। অতএব, তাকওয়াই হলো প্রকৃত মূল। যতক্ষণ এটি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা আমাদের উদ্দেশ্যেও সফল হতে থাকব। পবিত্র কুরআন ও শরিয়তের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাকওয়া অপরিহার্য, ইবাদতসমূহ সম্পাদনের জন্য তাকওয়া অপরিহার্য এবং পারিবারিক বিষয়সমূহে উত্তম আচরণ করার জন্যও তাকওয়া অপরিহার্য।

ইসলামে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে মুত্তাকি। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন যে, তিনি মুত্তাকিদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। তিনি মুত্তাকিকে ভালোবাসেন এবং মুত্তাকিদের পরিণামই সর্বোত্তম হবে।

নবী করিম, তাঁর প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের জন্যও তাকওয়াকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

আমরা যত ইচ্ছা অঙ্গীকার করতে থাকি, স্লোগান দিতে থাকি যে আমরা জামাআতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আমরা হযরত মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছি, আমরা মহানবী, তাঁর প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস রাখি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, তাহলে এসব স্লোগান কেবল স্লোগানই।

আল্লাহ্‌ তাআলা কল্যাণ ও সফলতার জন্য তাকওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে তাকওয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকওয়ায় উন্নতি করার চেষ্টা করো। তোমরা যদি তাকওয়ায় অগ্রসর হও, তাহলে ঈমান এবং আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হবে। আমরা যদি সফলতা অর্জন করতে চাই, নিজেদের সংশোধন করতে চাই এবং আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে চাই, তাহলে এর জন্য আমাদের মুত্তাকি হতে হবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলেছেন যে, এটি এমন একটি কিতাব, যার আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার কিতাব, তাঁর বাণী এবং তাঁর শরিয়ত থেকে তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া থাকবে।

অতএব, এই বিষয়টি সর্বদা নিজেদের সামনে রাখা উচিত যে, তাকওয়া ছাড়া ইসলামে মানুষের কোনো মর্যাদা নেই। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, বলেন যে, পবিত্র কুরআন তো তার অবতরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই নির্ধারণ করেছে-যাতে তাকওয়ার পথসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌ তাআলা আরেক স্থানে পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, মুমিনদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা এই কুরআনে আরোগ্য ও রহমত রেখেছেন; কিন্তু জালিমদের জন্য এটি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। যাদের মধ্যে তাকওয়া নেই, পবিত্র কুরআন তাদের কোনো পথ দেখাতে পারবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমাদের শরিয়ত এবং পবিত্র কুরআনে এই নির্দেশই রয়েছে যে, দৃষ্টিকে সংযত ও অবনত রাখো। মানুষ যদি এর ওপর আমল করতে শুরু করে এবং তাকওয়ার এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বহু পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।"

বর্তমান সমাজে এগুলোই সেইসব পাপ, যা পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, নারীদের সৌন্দর্যের আলোচনা শুনো না এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকো, যেসব কাজের কারণে তোমরা পদস্খলনের শিকার হতে পারো।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন যে, মহানবী, তাঁর প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর নির্দেশাবলি, নামাজ ইত্যাদি পালন করা ছাড়া পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

কিছু লোক প্রশ্ন করে যে, অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও দাবি করে যে তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইসলাম এবং মহানবী, তাঁর প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের এই দাবি নেই যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমন করেছে।

মানুষের কর্তব্য হলো চাওয়া থেকে বিরত না হওয়া এবং আল্লাহ্‌ তাআলার ভালোবাসার জন্য তাঁর কাছেই চাইতে থাকা। তিনি বলেন, এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন যে, মুত্তাকিরাই নামাজ কায়েম করে এবং কায়েম করা হয় কেবল সেই জিনিস, যা পড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া মানুষের প্রচেষ্টা নিষ্ফল। তাই সেই পরম দয়ালু ও অনুগ্রহশীল সত্তা বলেছেন যে, যতদূর সম্ভব তারা যেন তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে নামাজ কায়েম করার চেষ্টা করে। অতঃপর তারা যদি আমার বাণীর প্রতি ঈমান আনে, তাহলে আমি তাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর তাদের ছেড়ে দেব না; বরং আমি নিজেই তাদের সাহায্য করব। তখন তাদের নামাজ এক ভিন্ন রূপ ধারণ করবে এবং তাতে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা তাদের চিন্তা ও ধারণার মধ্যেও ছিল না।

এরপর আর্থিক ইবাদতও রয়েছে। মানুষ যতটুকু করতে পারে, তা হলো তার প্রিয় সম্পদসমূহ থেকে কিছু আল্লাহ্‌র জন্য প্রদান করা। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "তারা আমাদের প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"

তিনি বলেন, মানুষকে যে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত দেওয়া হয়েছে-যেমন তার জীবন, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, শক্তি, সম্পদ ইত্যাদি-এসবের ব্যাপারে মানুষ তার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেবল "আমরা তাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে" পর্যন্ত নিজের আন্তরিকতা প্রকাশ করতে পারে। এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য মানবিক শক্তির নেই।

তিনি বলেন, "এই অনুভূতি যে, এটি আমার জিনিস-এটিও একটি রোগ। তোমরা যদি প্রত্যেকটি জিনিসকে আল্লাহ্‌ তাআলার জিনিস মনে করো, তাহলে সেটিই তাকওয়া।"

হুযুর (আ.) বলেন যে, নামাজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও যত্নসহকারে আদায় করা উচিত। কারণ,

"নামাজ হলো সকল উন্নতির মূল এবং সোপান। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, নামাজ মুমিনের মেরাজ।"

এই দ্বীনে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আল্লাহ্‌র ওলী, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, আবদাল ও কুতুব অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁরা কীভাবে এসব মর্যাদা ও স্তর লাভ করেছিলেন? এই নামাজের মাধ্যমেই। মহানবী, তাঁর প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, বলেছেন, "আমার চোখের শীতলতা নামাজের মধ্যে নিহিত।"

হযরত মসীহ মওউদ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, বলেন যে, পবিত্র কুরআন বোঝার এবং এর অনুসারে হিদায়াত লাভ করার জন্য তাকওয়া অপরিহার্য। অতঃপর তিনি আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে, যতক্ষণ মানুষ তার নিকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলি পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ সে সেই নিকৃষ্ট গুণাবলির বিপরীত উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলি গ্রহণ করতে পারে না; কারণ দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় একই হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। মূল বিষয় হলো, মানুষ যেন তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করে। তিনি তাঁর জামাআতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌?তাআলা মুত্তাকিকে ভালোবাসেন।

আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ত্ব স্মরণ করে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকো এবং মনে রেখো যে, সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা। কারও ওপর জুলুম করো না এবং কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখো না। জামাআতে যদি একজন মানুষও কলুষিত হয়, তাহলে সে সবাইকে কলুষিত করে দেয়।

→ শেষাংশ ১২ পাতায়....

জুমআর খুতবা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা ও বাস্তব আদর্শ

"মানুষের প্রতি যখন আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহসমূহ থাকে, তখন তার উচিত সে যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর যদি কেউ তা না করে, বরং উল্টো অত্যাচার শুরু করে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকে সেই নিয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেন এবং তাকে শাস্তি দেন।" (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"সর্বাগ্রে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, স্বাস্থ্য দিয়েছেন, সুস্থতা দান করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং দ্বীনের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও প্রস্তুত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হলো, আমরা যদি আল্লাহ্?তাআলার এসব নিয়ামত গণনা করতে চাই, তাহলে কখনোই সম্ভব নয় যে আমরা সেই আল্লাহ্?র অনুগ্রহ ও দয়া-অনুগ্রহসমূহের হিসাব করতে পারব।" (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"হায়! হযরত মসীহ্? মওউদ (আঃ)-এর বিরোধীরা এবং আপনাকে না-মানা মুসলমানরা যদি আল্লাহ্?তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আল্লাহ্?তাআলার প্রেরিত ব্যক্তিকে মেনে নিতেন এবং নিজেদেরকে ঐক্যের সূত্রে গেঁথে নিতেন, তাহলে বর্তমানে মুসলমানরা যে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছেন, তা থেকে তারা রক্ষা পেতে পারতেন।"

"আমাদের প্রত্যেক প্রচারকেরও এই কথাটি মনে রাখা উচিত। অনেক সময় আমরা আপত্তিকারীদের আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকেও এমন কিছু কথা বলে ফেলি, যা আপত্তিকারীকে এই বলার সুযোগ দেয় যে, 'এগুলোই কি তোমাদের নৈতিকতা?' আমাদের নৈতিক মান তো অত্যন্ত উচ্চ হওয়া উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য কথা বর্ণনা করতে হবে, কিন্তু নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকে। তাদের মতো সেই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।"

মরহুমগণের স্মৃতিচারণ এবং তাঁদের গায়েবানা জানাযার নামাজ: সম্মানিত হাফেজ শাহবাজ আহমদ সাহেব, আইভরি কোস্টের মুবাল্লিগ; সম্মানিত ইয়েলানগানা মোমনি সাহেব, বুরকিনা ফাসোর; সম্মানিত ইয়াহইয়া সো মারি সাহেব, মালির; সম্মানিত সিরাজুল হক কুরেশী সাহেব, বার্ষিক জলসা রাবওয়ার উপ-অফিসার; সম্মানিত লাওয়াল তাইয়্যব সাহেব, নাইজেরিয়ার জামাতের শিক্ষক; এবং সম্মানিত মাস্টার গফুর আহমদ সাহেব, কানাডার।করুন।

খলিফায়ে ওয়াক্তের ভাষণের পর আমরা ইসলাম ও তাকওয়ার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছি। এই বিষয় সম্পর্কে আমরা গভীর উপলব্ধি ও জ্ঞান

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ আগস্ট , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৪ জহুর, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)তাঁর ব্যবহারিক আদর্শ এবং নির্দেশাবলীর কথা আমি জলসার আগের খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে আজও বর্ণনা করব।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে ছোটো-খাটো বিষয়ের জন্যও তিনি (সা.) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার এমন কাজে খুশি হন যে, যখন সে কোনো লোকমা খায় তখন এ জন্য তাঁর প্রশংসা করে অথবা যখন কোনো ঢোঁক পান করে তখন এ জন্য তাঁর প্রশংসা করে।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর, হাদীস-৪৯০১]

একইভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) একদিন বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং রুটির একটি টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি (সা.) রুটির টুকরোটি তুলেন, সেটি পরিষ্কার করেন এবং খেয়ে নেন, আর বলেন, "হে আয়েশা! সম্মানজনক জিনিসের মূল্যায়ন করো। রিযিকের এই নিয়ামত যখন কোনো জাতির কাছ থেকে চলে যায়, তখন তা আর তাদের কাছে ফিরে আসে না।" [সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩৩৫৩]

কাজেই, এটিই ছিল তাঁর (সা.) আমল বা ব্যবহারিক আদর্শ। এছাড়া তিনি (সা.) নিজেও প্রত্যেক ছোটখাটো বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর নিয়ামতরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। নিজের পরিবারের লোকদেরও এর উপদেশ দিতেন।

অতএব, আমরা যদি রিযিকে বরকতের আকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবী তালিব (রা.)-এর বাড়িতে গমন করেন। সে সময় তিনি (সা.) ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কাছে আমার খাওয়ার মতো কোনো খাবার আছে কী?" তিনি নিবেদন করেন, 'শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই এবং সেগুলো আপনার সমীপে পেশ করতে আমার লজ্জা লাগছে।' তিনি (সা.) বলেন, "তা-ই নিয়ে আসো।" তিনি (সা.) সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে পানিতে ভেজান। তিনি (উম্মে হানী) লবণ নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, "কোনো তরকারি আছে কী?" তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! (বাড়িতে) সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি (সা.) বলেন, "তা-ই নিয়ে আসো।" তিনি (সা.) তা নিজের খাবারের ওপর ঢালেন এবং তা খান আর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র মহিমা কির্ত্তন করেন। তারপর বলেন, "সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি! হে উম্মে হানী! যে বাড়িতে সিরকা থাকে, সে-ই গৃহ দরিদ্র হয় না।" [আল মুজামুস সাগীর লিতরিানি, পৃ:৬১৫-৬১৬]

অতএই, এমন ছিল তাঁর (সা.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মান। আমরা এসব দেশে (পাশ্চাত্যে) বসবাস করি। অগণিত নিয়ামত থেকে আমরা উপকৃত হই, তবুও আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি না, বরং কখনো কখনো ছোটখাটো বিষয়ে অভিযোগ দানা বাঁধে। বাড়ির লোকদের কাছে অভিযোগ করা হয় যে, এটা নিয়ে আসোনি, ওটা নিয়ে আসোনি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই অকৃতজ্ঞদের চিত্র এবং সম্মানিত সাহাবীদের কৃতজ্ঞতার চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

'তোমাদের শরীরে কখনো ছেঁড়া কাপড় থাকলে তোমরা কাঁদতে আরম্ভ করো এবং বলতে থাকে যে, আমাদের কপাল কেমন পুড়েছে যে পরার জন্য ছেঁড়া কাপড় জুটেছে। কিন্তু সাহাবীদের ছেঁড়া কাপড় জুটলে তাঁদের মাথা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হতো। তাঁর অনুগ্রহের স্মরণে তাঁদের জিহ্বা সিক্ত হয়ে যেত এবং তাঁরা বলতেন, 'কতই না সুন্দর কাপড় যা আমাদের খোদা আমাদেরকে দিয়েছেন।' তাঁরা যদি চারদিন পর শুকনো রুটির একটি টুকরো পেতেন, তাহলে আনন্দে তাঁদের চোখে আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠত এবং তাঁরা বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! খোদা আমাদেরকে তাঁর নিয়ামতে ধন্য করেছেন।' এ কারণেই শুকনো রুটির টুকরো তাদের যেভাবে উপকৃত করেছিল [তিনি (রা.) জামা'তের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন,] তা পোলাও-কোরমাও তোমাদেরকে করে না। আজ যে পোলাও পায়, সে পোলাও তো খেতেই থাকে, কিন্তু সাথে সাথে তার মাঝে এই আক্ষেপও থাকে যে, হায়! পোলাওয়ের সাথে যদি জর্দাও থাকত। যে পোলাও এবং জর্দাও পায়, সে-ও রক্তাশ্রু বর্ষণ করে এবং বলে, জর্দার সাথে যদি ফিরনিও থাকত। যার ডাল জোটে, সে মাংসের জন্য কাঁদে। যার মাংস জোটে, সে ভাতের জন্য ছটফট করে। যার খাওয়ার জন্য চারটি রুটি জোটে, [এভাবে তিনি (রা.) অনেক বিস্তারিতভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।] যাইহোক, তিনি (রা.) বলেন, 'কিন্তু সেই সাহাবীদের কী অবস্থা ছিল! সেখানে শুকনো-নিরস রুটির টুকরো জুটলেও সাহাবীরা বলতেন, 'আমরা তো এই টুকরোরও যোগ্য ছিলাম না, এটি তো খোদা তা'লারই কৃপা যে, তিনি এই টুকরো আমাদেরকে দান করেছেন। ফলস্বরূপ, শুকনো রুটির টুকরোই তাঁদের শরীরে শক্তি জোগাতো। তা তাঁদের মাঝে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহস সৃষ্টি করত। উচ্চ মনোবল সৃষ্টি হতো। তাঁদের কৃতজ্ঞতার স্পৃহাকে তা আরও বাড়িয়ে দিত।' মক্কা বিজয়ের দিন, যেদিন আরবের নেতৃত্বের দম্ভ চূর্ণ হয়ে এবং মহানবী (সা.) দশ হাজার পুণ্যবান সাহাবীর সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কার বড়ো বড়ো সর্দার, যাদের গোটা জীবন ইসলামের শত্রুতায় অতিবাহিত হয়েছে, তারা নতশীরে তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি (সা.) তাদের সামনে এই ঘোষণা দেন যে, "যাও, আমি তোমাদেরকে কিছুই বলব না। তোমরা সবাই আমার পক্ষ থেকে মুক্ত।" এই ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি (সা.) নিজের [এখানে ফুফু লেখা রয়েছে। ভুলবশত লিপিকারের প্রমাদ মনে হচ্ছে অথবা তিনি ভুলবশত বর্ণনা করেছেন]

যাইহোক, হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর বাড়িতে গমন করেন এবং উম্মে হানী (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)-এর চাচাতো বোন। যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, "খাওয়ার মতো কিছু আছে কি?' তিনি বলেন, 'খাওয়ার মতো তো কিছুই নেই, [যেমনটি এখনই বর্ণনা করা হয়েছে,] যদি আমার কাছে থাকত তাহলে আমি নিজেই খাইয়ে দিতাম, শুধু একটি শুকনো রুটি ছাড়া, যা কয়েক দিন ধরে পড়ে আছে।' তখন তিনি (সা.) বলেন, "আচ্ছা, সেটিই নিয়ে আসো।" যখন তিনি (উম্মে হানী) রুটিটি তাঁর (সা.) সমীপে নিয়ে আসেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, "এটি তো খুব উত্তম রুটি, অথচ তুমি এমনিতেই বিষণ্ণ হচ্ছো যে ,আমার ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই।'এরপর তিনি পানি নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) রুটিটি পানিতে ভেজান, এরপর জিজ্ঞেস করেন, "তরকারি আছে? তিনি বলেন, 'তরকারি কোত্থেকে আসবে, আমার কাছে তো রুটিও ছিল না, থাকলে তো আগেই নিয়ে আসতাম। আমার কাছে সামান্য একটু সিরকা আছে।' মহানবী (সা.) বলেন, "(সিরকা) কতই না ভালো তরকারি!" তিনি সিরকা নিয়ে আসেন, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিনি (সা.) (রুটি) ভেজান ও তা খেতে আরম্ভ করেন।

তিনি [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)] বলেন, মহানবী (সা.) সিরকাকেও খোদার নিয়ামত মনে করেছেন এবং তা দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রফুল্লতার কারণে হজমশক্তি সৃষ্টি হয়, যা (মুলত) হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। যদি সানন্দে একটি সাধারণ জিনিসও খাওয়া হয়, তবে তাও অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্তু যদি দুঃখকষ্ট নিয়ে সর্বোত্তম জিনিসও খাওয়া হয়, তা মানুষের মাঝে কোনো শক্তি সৃষ্টি করে না।'

তিনি (রা.) আরও বলেন, 'লোকেরা মনে করে, আমাদের বেশি জিনিস পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কম পেয়েছি, কিন্তু সাহাবীগণ প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে এটিই মনে করতেন যে, কম পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু বেশি পাওয়া গেছে। তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরন এমন ছিল যে, সামান্য একটু জুটলেও তাঁরা বলতেন, 'এটিও অনেক বেশি।' এ কারণে একটি রুটিও তাঁদেরকে এমনভাবে উপকৃত করত দশ-দশটি রুটিতেও তোমাদের সেই উপকার হয় না।'

তারপর তিনি (রা.) বলেন, 'এটি কারণে হলো, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করোনি।

তোমাদের হৃদয় এই সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত যে, খোদা তোমাদেরকে এক মহান আধ্যাত্মিক কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং খোদা যাকে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টি করেন, তার তুলনায় পৃথিবীর বড় থেকে বড় বাদশাহও তুচ্ছ। কিন্তু নিজেদের মর্যাদাকে বোঝার এবং নিজেদের দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে, তোমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নীচ ছোটখাটো বিষয়ের দিকে মনোযোগী হয়ে যাও। তোমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নীচ ছোটখাটো বিষয়ের দিকে ধাবিত হও এবং বলো যে, আমি এটা পাইনি, আমি ওটা পাইনি। যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, খোদা তোমাদেরকে কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের মর্যাদাকে চিনতে পারো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কী-ই বা কাজ করবে? খোদা তোমাদেরকে এমন এক স্থানে দাঁড় করিয়েছেন যে, তোমাদের হৃদয় সব সময় খুশির তরঙ্গে পূর্ণ থাকা উচিত এবং তোমাদের মাঝে সব সময় সচেতনতা ও সতর্কতা দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। যদি এই বিষয়টি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের মাঝে এমন শক্তির সঞ্চার হবে যে, সামান্য থেকে সামান্য খাবারও তোমাদেরকে কাজ করার যোগ্য বানিয়ে দেবে।

[আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৭৫] [উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩]

সুতরাং, এটি হলো সেই ব্যবস্থাপত্র, যা সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর, যাদের স্বল্প সম্বল রয়েছে তাদেরও, কিন্তু বিশেষভাবে জীবন উৎসর্গকারীদের নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মান বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা উচিত। এর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং একইভাবে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের মাঝেও এর অনুভূতি আরও অধিক হারে জাগ্রত করা প্রয়োজন। কারণ যে উদ্দেশ্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারীরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন, তা অত্যন্ত মহান উদ্দেশ্য এবং মহান উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য, মহান উদ্দেশ্য অর্জনকারীদের আদর্শ সামনে থাকতে হবে এবং সেগুলোর ওপর আমল করার প্রচেষ্টা থাকতে হবে, তবেই সেই উদ্দেশ্যও অর্জিত হতে পারে।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) সেবা ও কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে তাদেরকে কী পরিমাণ দোয়ায় সিক্ত করতেন, এ সম্পর্কে হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তোমাদের সারা সন্ধ্যা ও সারা রাত চলবে এবং আগামীকাল ইনশাআল্লাহ পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাঁরা কোনো এক সফরে ছিলেন। লোকেরা এমনভাবে চলতে থাকে যে, কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায়নি। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) চলতে থাকেন, এমনকি মধ্যরাত পার হয়ে যায় এবং আমি তাঁর (সা.) পাশেই ছিলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তন্দ্রা এলে তিনি নিজ বাহনের ওপর একপাশে হেলে পড়েন। আমি তাঁর (সা.) কাছে যাই এবং তাঁকে না জাগিয়েই সোজা করে দেই, যতক্ষণ না তিনি ঠিক হয়ে নিজ বাহনে বসে পড়েন। তারপর তিনি (সা.) চলতে থাকেন, এমনকি রাতের বেশিরভাগ অংশ কেটে যায়, তিনি (সা.) আবারও তন্দ্রার কারণে নিজ বাহনে হেলে পড়েন। তিনি (আবু কাতাদা) বলেন, আমি আবারও তাঁকে না জাগিয়েই সোজা করে দিই, যতক্ষণ না তিনি পুনরায় নিজের বাহনে ঠিক হয়ে বসে পড়েন। তিনি বলেন, তারপর একইভাবে তিনি চলতে থাকেন, এমনকি সাহ্‌রির শেষ প্রহর চলে আসে। তখন তিনি (সা.) আগের দুবারের চেয়েও বেশি হেলে পড়েন, এমনকি তিনি উল্টে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমি তাঁর (সা.) কাছে যাই এবং তাঁকে সোজা করে দেই। তখন তিনি (সা.) মাথা তুলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি নিবেদন করি, আবু কাতাদা। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলছ? আমি বললাম, রাত থেকেই আমি আপনার সাথে চলছি। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার হেফাজত করুন, যেভাবে তুমি তাঁর নবীর হেফাজত করেছ। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস-১০৯১]

তিনি (সা.) একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি (সা.) নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কী আদর্শ আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন?

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমার মহাপ্রতাপান্বিত প্রভু আমার কাছে মক্কার উপত্যকাকে সোনায় পরিণত করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন, তখন আমি নিবেদন করি, হে আমার প্রভু! না, বরং আমি চাই যে, একদিন ক্ষুধার্ত থাকব এবং একদিন তৃপ্ত থাকব। যাতে যখন আমি তৃপ্ত থাকি, তখন আমি তোমার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আর যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকি, তখন তোমার দরবারে বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করি এবং তোমার কাছে দোয়া করি। [কিতাব আখলাকুন নবী (সা.), প্রণেতা-ইবনে হায়ান আল আসবাহানী, পৃ: ২২৪]

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন পানি পান করতেন, তখন পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে তিন শ্বাসে পান করতেন। এক শ্বাসেই পুরো গ্লাস পান করে নিতেন না, বরং তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। প্রতি শ্বাসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন এবং শেষ শ্বাসের পর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। [কিতাব আখলাকুন নবী (সা.), প্রণেতা-ইবনে হায়ান আল আসবাহানী, পৃ: ১৯১]

যেমনটি তিনি (সা.) বলেছেন যে, পানির এক ঢোঁক নিলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাঁর প্রশংসা করো। এটি হলো কৃতজ্ঞতার সাথে পানি পানের পদ্ধতি। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও জরুরি যে, একবারে পান করার পরিবর্তে ধীরে ধীরে থেমে থেমে পান করা উচিত।

বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন যে, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, একদিন ক্ষুধার তাড়নায় নিজের কলিজাকে ধরে রাখার জন্য আমি মাটিতে শুয়ে ছিলাম। আমি নিজের কলিজাকে ধরে রাখার জন্য মাটিতে পেট লাগিয়ে রাখতাম এবং কখনো তো ক্ষুধার তাড়নায় নিজের পেটে পাথর বেঁধে নিতাম। এটি একদিনের কথা নয়, বেশ কয়েক দিনের কথা। তিনি বলেন, একদিন আমি মানুষের চলাচলের রাস্তায় বসে পড়ি, যেখান দিয়ে লোকেরা আসত। আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সেখান দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র কিতাব, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম, যা গরিবদের খেয়াল রাখা, না চাওয়া ব্যক্তিদের এবং ক্ষুধার্ত মানুষের বিষয়ে ছিল। তো তিনি আমাকে তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। এরপর হযরত উমর (রা.) আসেন। তিনিও একইভাবে আমাকে তার অর্থ বলে চলে যান। এরপর মহানবী (সা.) আমার পাশ দিয়ে যান এবং তিনি (সা.) যখন আমাকে দেখেন, তখন তিনি মুচকি হাসেন এবং আমার ভেতরের অবস্থা, যা আমার চেহারায় ফুটে উঠেছিল, তা তিনি বুঝে যান। তিনি (সা.) ডাকেন, আবা হির! আমি বললাম, উপস্থিত আছি, হে আল্লাহ্‌র রসুল! (সা.)। তিনি (সা.) বলেন, আমার পেছনে এসো। তিনি (সা.) ঘরে যান, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাই। তিনি ভেতরে যান, আমাকেও ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

ভেতরে তাঁর (সা.) কামরায় একটি দুধের পেয়ালা রাখা ছিল। ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করেন, এটি কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা জানায়, কারো পক্ষ থেকে উপঢৌকন এসেছে। যাই হোক, তিনি (সা.) ডাকেন, আবা হির! আমি বললাম, উপস্থিত আছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সা.)। তিনি (সা.) বলেন, আহলে সুফফাদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরা এমন লোক ছিল যারা বেশিরভাগ সময় ক্ষুধার্তই থাকত এবং সারাক্ষণ সেখানে বাইরেই বসে থাকত। লোকেরা তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবার ইত্যাদি খাওয়াতো। যাই হোক, তিনি (সা.) তাদেরকে ডাকেন। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমার কাছে তাঁদেরকে ডাকার বিষয়টি খারাপ লাগে। আমি ভাবলাম, আহলে সুফফাদের সামনে এই সামান্য একটু দুধ কী কাজে আসবে? আমিই বেশি হকদার ছিলাম যে, আমি এই দুধ থেকে কিছুটা পান করতাম, যাতে আমার মাঝে শক্তি আসত। আর যদি তারা চলে আসে এবং তিনি (সা.) আমাকে নির্দেশ দেন যে তাদের দাও, তবে তো আমাকে দিতেই হবে। আর তখন তো আমার কোনো আশা নেই যে এই দুধ থেকে আমার ভাগ্যে কিছু জুটবে। কিন্তু আল্লাহ্? এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। অবশেষে আমি তাদের কাছে যাই এবং তাদেরকে ডাকি। আহলে সুফফাগণ (রা.) চলে আসেন এবং নিজেদের জায়গায় বসে পড়েন। তিনি (সা.) ডাকেন, আবা হির, আবু হুরায়রা! আমি বললাম, উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.)। তিনি (সা.) বলেন, এটি নাও এবং তাদেরকে দাও। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমি সেই পেয়ালাটি নেই। আমি একজনকে দিতাম, সে পান করত, এমনকি সে তৃপ্ত হয়ে যেত। তারপর দ্বিতীয়জন, তৃতীয়জন, এভাবে তারা পান করতে থাকে। পরিশেষে আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছি আর যারা বসেছিল, তারা সবাই তৃপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা খুব ভালোভাবে দুধ পান করেছিল। তিনি (সা.) সেই পেয়ালাটি নেন এবং তা নিজের হাতে রাখেন, তারপর আমার দিকে তাকান এবং মুচকি হাসেন আর ডাকেন, আবু হুরায়রা! আমি বললাম, উপস্থিত আছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সা.) তিনি বললেন, আমি আর তুমিই বাকি রয়েছি। আমি বললাম, আপনি সত্য বলেছেন, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! তিনি (সা.) বললেন, বসো এবং পান করো। আমি বসে গেলাম এবং পান করতে লাগলাম। তিনি (সা.) বললেন, আরো পান করো। আমি আরো পান করলাম। তিনি এটি বলতে থাকলেন, আরো পান করো। আমি এতটা পান করলাম যে, অবশেষে আমি বললাম, না, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! এখন আর এটি পান করার মতো কোনো জায়গা আমার নেই। অর্থাৎ একেবারে পেট ভরে গেছে। তিনি (সা.) বললেন, আমাকে দেখাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম; অথচ তিনিও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি (সা.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে অবশিষ্ট দুধটুকু পান করে নিলেন।

[সহীহ আল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস-৬৪৫২]

এটি ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এই কৃতজ্ঞতার কারণেই আল্লাহ তা'লা এতে এমন বরকত দান করলেন, সব সাহাবীও পান করলেন এবং তিনিও (সা.) এর মাধ্যমে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হয়, তার উচিত তার প্রতিদান দেওয়া। আর এর সামর্থ্য যার নেই, তার উচিত মানুষের সামনে সেই উপকারের কথা উল্লেখ করা। কারণ যে ব্যক্তি উল্লেখ করে, সে মূলত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি লৌকিকভাবে নিজের অহংকার প্রদর্শন করে, অথচ সেই বড়ত্ব করার অধিকার তার নেই- সে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধান করল; অর্থাৎ সে আপাদমস্তক মিথ্যাচারী।[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, খণ্ড-৮, পৃ: ১৪২-১৪৩]

রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর মামা আসওয়াদ বিন যাহাব বিন আবদে মানাফ বিন যুহরাহ তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা.) বললেন, হে আমার মামা! ভেতরে আসুন। তিনি ভেতরে এলে মহানবী (সা.) তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর ওপর বসুন, কারণ মামা পিতার সমতুল্য। হে মামা! যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হয় আর সে যদি তার পূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায় করতে না-ও পারে, তবে অন্তত সেই উপকারের কথা স্মরণ (বা উল্লেখ) করা উচিত, কেননা সে যখন তা উল্লেখ করে, সে যেন কৃতজ্ঞতাই আদায় করে নিল।

[আস সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩]

আর আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই গুণটি কীভাবে দেখতে পাই!

এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি (সা.) সর্বদা নিজের উপকার সাধনকারীদের মনে রাখতেন এবং সুযোগ পেলেই তাদের উপকারের কথা উল্লেখ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, হযরত খাদীজা (রা.)- যিনি তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন- যিনি প্রতি পদক্ষেপে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা অনুধাবন করে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তিনি মক্কার এক ধনাঢ্য রমণী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে যখন তাঁর বিয়ে হলো তখন তিনি তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর চরণে সমর্পণ করে বললেন, আপনি যেভাবে ইচ্ছা এগুলো ব্যবহার করুন।

এছাড়া নবুওয়তের দাবির পর প্রতিটি কষ্ট-কাঠিন্যে তিনি পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমনকি নবুওয়তের দশম বছরে তাঁর ইন্তেকাল হয়। মহানবী (সা.) নিজের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই অনুগত স্ত্রীর অবদান মনে রেখেছেন এবং সর্বদা তাঁর গুণাবলির কথা আলোচনা করতেন। তিনি এত বেশি তাঁর কথা স্মরণ করতেন যে, তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীগণও ঈর্ষা বোধ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখনই হযরত খাদীজা (রা)-এর কথা আলোচনা করতেন, প্রশংসা করতেন এবং খুব সুন্দর ভাষায় তাঁর প্রশংসা করতেন। একদিন আমার মনে কিছুটা আত্মমর্যাদা জেগে উঠল এবং আমি নিবেদন করলাম, আপনি কেন সেই বৃদ্ধার কথা বার বার স্মরণ করেন, অথচ আল্লাহ তা'লা আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম সব স্ত্রী দান করেছেন? এটি শুনে মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো স্ত্রী দান করেন নি, কেননা খাদীজা তখন আমাকে গ্রহণ করেছে, যখন অন্যরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মানুষ যখন আমাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সে তাঁর সম্পদ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছিল। আর আল্লাহ তা'লা তাঁর মাধ্যমেই আমাকে সন্তানসন্ততি দান করেছেন, অথচ অন্য স্ত্রীদের মাধ্যমে আমাকে কোনো সন্তান দেন নি। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, খণ্ড-৮, পৃ: ২০৪]

মহানবী (সা.) সারা জীবন তার অর্থাৎ হযরত খাদীজার সেবার কথা স্মরণ রেখেছেন এবং সবসময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে তাঁর বন্ধুরা যেভাবে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তিনি তাঁদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। একবার হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। সেই বিষয়টি যখন রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি সাহাবীদের সামনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বড়ো বড়ো অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে কষ্ট না দেবার জন্য সাহাবীদের সতর্ক করলেন। তিনি বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন এবং আপনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। ঘটনার পর উভয়ই যখন বিষয়টি নিয়ে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন তখন উভয়ই নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও বলেন, আমি হযরত উমরের প্রতি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, এর জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। হযরত উমর (রা.)-ও বললেন, আমিও আপনার প্রতি অন্যায় করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। যাহোক, রসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর কথায় সন্তুষ্ট হন নি। বরং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, তিনি কেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনার ভুলত্রুটি আড়াল করুন এবং আপনাকে ক্ষমা করুন। এরপর হযরত উমর (রা.)-ও অনুতপ্ত হন, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে যান । তাঁরা দুইজন যখন একসাথে বসা ছিলেন তখন রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

হে লোকসকল! আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তখন তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু আবু বকর বলেছে, তুমি সত্যবাদী। সে নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রকাশ করেছে। তোমরা কি আমার এই সঙ্গীকে আমার জন্য ছেড়ে দেবে না? (অর্থাৎ আমার খাতিরে তাকে শান্তিতে থাকতে দিবে না?) রসুলুল্লাহ (সা.) এই কথাটি দুইবার বললেন। এরপর থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আর কখনো কষ্ট দেওয়া হয় নি। বরং সবসময় তাঁর (মর্যাদা ও সম্মানের) প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হতো।

[সহীহ আল বুখারী, কিতাব ফাযাইলে আসহাবিন নবী, হাদীস-৩৬৬১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) একবার লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'লা তাঁর এক বান্দাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে, সে চাইলে দুনিয়াকে বেছে নিতে পারে অথবা আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার ও নিয়ামত রয়েছে, তা বেছে নিতে পারে। তখন সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, সেটিকেই বেছে নিল। হযরত আবু সাঈদ বলেন, একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর কান্না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, রসুলুল্লাহ (সা.) তো এমন একজন বান্দার কথা বলছিলেন, যাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে থাকা

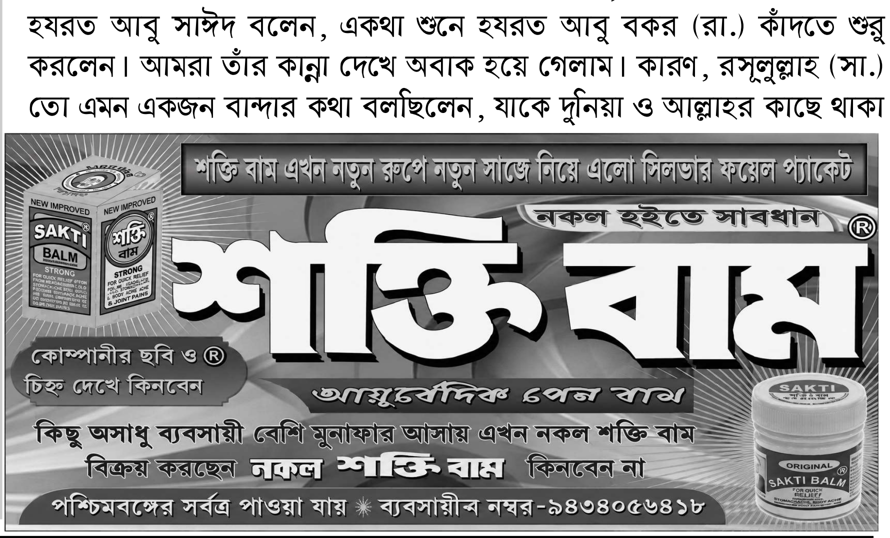

নিয়ামতের মধ্যে একটি বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাহলে আবু বকর (রা.) কেন কাঁদছেন? আসলে রসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই সেই বান্দা ছিলেন যাঁকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-ই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি কাঁদতে লাগলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিজের সাহচর্য ও নিজের সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন আবু বকর। আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রভু ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। [সহীহ আল বুখারী, কিতাব ফাযাইলে আসহাবিন নবী, হাদীস-৩৬৫৪]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর কান্নার কারণ ছিল- রসূলুল্লাহ (সা.)-এর একথা শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ তা'লা সম্ভবত তাঁর প্রিয় রসূলকে নিজের সান্নিধ্যে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন।

মক্কায় যখন মুসলমানদের ওপর একের পর এক নির্যাতন ও নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, তখন তারা আল্লাহ তা'লার অনুমতিক্রমে হাবশার দিকে হিজরত করেন। সে সময় হাবশার বাদশা (নাজ্জাশি) তাঁদেরকে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) নাজ্জাশির এই উপকারের কথা সবসময় স্মরণ রাখতেন। তিনি (সা.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সেই উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একবার নাজ্জাশির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে, তিনি (সা.) তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন সাহাবীরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমরাই যথেষ্ট

মহানবী (সা.) বলেন, তারা আমাদের সঙ্গীদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রেখেছিল, অনেক মর্যাদা দিয়েছিল। আর আমি নিজেই তাদের সেই উপকারের প্রতিদান দিতে চাই।[আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১]

অতঃপর তিনি (সা.) সেই কৃতজ্ঞতার অনুভূতির অধীনেই বাদশাহর গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়েছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে নাজজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি (সা.) তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করলেন। সাহাবিরা তাঁর পেছনে কাতারবন্ধ হলেন এবং তিনি (সা.) এতে চার তাকবির বললেন। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫১, হাদীস-৯৬৪৪]

আনসারদের কর্মের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বছরে, হিজরতের পূর্বে, মদীনা থেকে সত্তরজন লোক এসে তাঁর হাতে বায়আত করেছিলেন এবং অঙ্গীকার করেছিলেন যে, হুযূর যখন মদীনায় আগমন করবেন, তখন আমরা নিজেদের জীবনের মতো হুযূরের সুরক্ষা করব।

এ সময় একজন আনসারি সাহাবি আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মদীনার ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। আপনার সঙ্গ দেওয়ার কারণে সে-সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন যেন না হয়, আল্লাহ যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন, তখন আপনি আমাদের ছেড়ে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসবেন।' হুযূর (সা.) বললেন, 'না, না। এমন কখনোই হবে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত হবে, তোমাদের বন্ধুরা আমার বন্ধু হবে এবং তোমাদের শত্রুরা আমার শত্রু হবে।' [আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩১৫][সুবুলুল হুদাওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২০১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য অযুর পানি রেখে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কে রেখেছে?' যখন তিনি (রা.) নিজের কথা বললেন, তখন হুযূর (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করলেন, 'اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ'-'হে আল্লাহ! তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করুন।'[সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ওয়াজু, হাদীস-১৪৩]

মহানবী (সা.) সামান্য একটি কাজের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

এক বর্ণনায় আছে, গাজওয়ায়ে খায়বারের পর পথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে হযরত সাফিয়্যার বিবাহ হয়। বিবাহের রাতে হযরত আবু আইয়্যুব খালিদ বিন যায়েদ (রা.) সারা রাত মহানবী (সা.)-এর তাঁবুর বাইরে পাহারা দিয়েছিলেন। যখন মহানবী (সা.) সকালে জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, আবু আইয়্যুব বাইরে পাহারা দিচ্ছেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু আইয়্যুব! সব ঠিকঠাক তো? কী ব্যাপার?'

তিনি আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনার ব্যাপারে এই নারীকে নিয়ে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল- পাছে সে আপনার কোনো ক্ষতি করে। কারণ খায়বারের যুদ্ধে আপনি তার পিতা, তার স্বামী এবং তার লোকদের হত্যা করেছেন। আর সে নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কারণে তার পক্ষ থেকে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় সৃষ্টি হয়েছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর এই আন্তরিকতা দেখে মহানবী (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আবু আইয়্যুবকেও অনুরূপভাবে হেফাজত করো, যেভাবে সে সারা রাত আমার হেফাজত করেছে।' [আর রাউজুল উনাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৫]

মুতইম বিন আদী সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কুরাইশদের জুলুমপূর্ণ চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মহানবী (সা.)-কে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করিয়েছিলেন। অতএব, যখন বদরের বন্দীদের তাঁর (সা.) সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি (সা.) মুতইমের উপকারের কথা স্মরণ করলেন। বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ বিন জুবায়ের তাঁর পিতা হযরত জুবায়ের বিন মুতইম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বদরের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মুতইম বিন আদী যদি জীবিত থাকতেন এবং এই অপবিত্র লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করতেন, তাহলে তাঁর কারণে আমি এদের ছেড়ে দিতাম।' [সহীহ আল বুখারী, কিতাব ফরজুল খুমুস, হাদীস-৩১৩৯] [আসসীরাতুল হালবিয়া,১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৭, ৫০৭]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এই ঘটনাটি লিখেছেন। আর এই ঘটনা লেখার পর তিনি লিখেছেন যে, মুতইম একজন পাক্কা মুশরিক ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কিন্তু তাঁর স্বভাবের মধ্যে সততা ও মহত্ত্বের উপাদান ছিল। তাই কুরাইশদের সেই জুলুমপূর্ণ চুক্তিপত্র, যার কারণে মুসলমানরা শে'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, সেটিও মুতইমই ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। আর যখন মহানবী (সা.) তায়েফ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখনও মুতইমই তাঁকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করিয়েছিলেন। এই ছিল সেই উপকারের স্মৃতি, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহানবী (সা.) এই কথাগুলো বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর এটি একটি বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যখনই কোনো ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সামান্যও ভালো আচরণ করত, তিনি কখনো তার উপকার ভুলে যেতেন না। বরং তাঁর সবসময় এই আকাঙ্ক্ষা থাকত যে, তিনি যেন তার উপকারের প্রতিদান দেওয়ার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পান। এমনটি কখনো ছিল না যে, দুনিয়াদার মানুষের মতো একবার কারো উপকারের জবাবে ভালো আচরণ করে নিয়ে তারপর বলতে শুরু করবেন- 'ব্যস, এখন উপকারের প্রতিদান দেওয়া হয়ে গেছে।' বরং তিনি সারা জীবন তার উপকারের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করতেন অথবা তার উপকারের কথা স্মরণ করতেন।

[সূত্র: সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবি'আহ মাখযুমি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার ঋণ নেওয়া হয়েছিল এবং যখন হুনাইন থেকে ফিরে আসলেন, তখন তা পরিশোধ করে দিলেন। এরপর নবী (সা.) তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ তা'লা তোমার পরিবার-পরিজন ও তোমার সম্পদে বরকত দান করুন।'

সম্পদ ও ঋণের প্রতিদান হলো তা পূর্ণরূপে পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা; অর্থাৎ ঋণদাতার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা জরুরি।

[সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সাদাকাত,হাদীস-২৪২৪]

হযরত আমর ইবনে আখতাব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) পানি চাইলেন। আমি তাঁর জন্য একটি পাত্রে পানি নিয়ে এলাম। তাতে একটি চুল ছিল। আমি সেই চুলটি বের করে দিলাম এবং সামান্য একটি বিষয়- সেই পাত্রটি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করলাম। তখন মহানবী (সা.) বললেন, 'আল্লাহুম্মা জাম্মিলহু'-অর্থাৎ-'হে আল্লাহ! তাকে সুন্দর করে দিন।' এমন কোনো সুযোগ ছিল না, সামান্য কোনো বিষয়ও হোক, যার জন্য তিনি (সা.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি দেখেছি, তাঁর এই দোয়ার প্রভাব তাঁর ওপর এমন হয়েছিল যে, তিনি তিরানব্বই বছর বয়স লাভ করেছিলেন, অথচ তাঁর মাথা ও দাড়িতে একটি চুলও সাদা হয় নি।

[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬০০, হাদীস-২৩২৭১]

অনুরূপভাবে একটি বর্ণনা হযরত কাতাদা (রা.) থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) মহানবী (সা.)-কে বললেন, 'আনাস আপনার খাদেম।' তখন তিনি (সা.) আনাসের জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন এবং আপনি তাকে যা দান করেছেন, তাতে তার জন্য বরকত দান করুন।' [সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৩৪]

এই দোয়া কবুল হওয়ার কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমার সম্পদ অনেক বেশি এবং আমার সন্তান ও আমার সন্তানদের সন্তানদের সংখ্যা আজ প্রায় একশতে পৌঁছে গেছে।' [সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযাইলিস সাহাবা, খণ্ড-১৩, পৃ: ১২৪, হাদীস-৪৫১৭]

এরপর তিনি (সা.) নসিহত করতে গিয়ে বলেন, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির প্রতি কোনো উপকার করা হয়, অতঃপর সে যদি সেই উপকারের কথা প্রকাশ করে, তাহলে সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করল। আর যে ব্যক্তি তা গোপন করেছে, সে তার অকৃতজ্ঞতা করল।' [সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৮১৪]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদানও দিতেন।

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-৩৫৩৬]

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো উপহার দেওয়া হয়, তাহলে তার

সামর্থ্য থাকলে সে যেন সেই উপহারের প্রতিদান দেয়। আর যদি তার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সে যেন উপহারদাতার প্রশংসা করে। কারণ যে ব্যক্তি তার প্রশংসা করল, সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করল; আর যে ব্যক্তি তা গোপন করল, সে অকৃতজ্ঞতা করল।'

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৮১৩]

এগুলো হলো সেসব মৌলিক চারিত্রিক গুণাবলী যা সমাজে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যক।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সা.)-কে একটি মাদি উট উপহারস্বরূপ উপস্থাপন করে। তিনি (সা.) তাকে এর বদলে ছয়টি মাদি উট প্রদান করেন।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব,হাদীস-৩৯৪৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে যাচনা করে। রসূলুল্লাহ (সা.) ঋণ নিয়ে তাকে অর্ধেক ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় আশি কেজি শস্য দিলেন। যখন ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি সেটি ফেরত চাইতে আসলো তখন তিনি (সা.) তাকে এক ওয়াসাক দিলেন আর বললেন, অর্ধেক ওয়াসাক তার ঋণ পরিশোধ স্বরূপ আর অর্ধেক ওয়াসাক কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার জন্য উপহার।

[আশ শিফা, তারিফ হুকুকুল মুস্তফা, পৃ: ৭৭-৭৮]

হযরত আবু হিনদ বর্ণনা করেন, তামিম বিন আওস আদ দারি (রা.) সিরিয়া থেকে মদীনাতে লণ্ঠন, যয়তুনের তেল ও সেলাই করা দড়ি নিয়ে আসলেন। তিনি যখন মদীনায় পৌঁছালেন তখন ঘটনাচক্রে সেটি বৃহস্পতিবার রাত ছিল। তিনি নিজের ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন, সে রশি প্রস্তুত করে মসজিদে নববীতে লণ্ঠন ঝুলালো, ল্যাম্প ছিল; সেগুলোতে তেল ঢাললো, সলতে রেখে দিল। যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তামিম নিজের ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন এগুলো জ্বেলে দাও। রসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, মসজিদ এসব লণ্ঠন দ্বারা আলোকিত হচ্ছে। তিনি (সা.) এটি দেখে খুব খুশি হলেন আর বললেন, এটি কে করেছে? লোকেরা নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! তামিম দারি করেছেন। তিনি (সা.) তাকে দোয়া দিলেন আর বললেন, তুমি ইসলামকে আলোকিত করেছ। আল্লাহ্ ইহজগত ও পরকালে তোমাকে আলোকিত করুন। এরপর বললেন, যদি আমার কোন কন্যা থাকতো তাহলে আমি তার বিবাহ তোমার সাথে দিতাম। অর্থাৎ, তিনি মসজিদকে আলোকিত করেছেন দেখে তার এ কাজকে এতটা বাহ্বা দিয়েছেন।

[আল জামিউ আল হাকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড,পৃ: ২২০৫-২২০৬]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) রাতে নামাযের জন্য এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। এটি দেখে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! এমনটা কেন করেন? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে পূর্বের পাপ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন আর পরবর্তী পাপ থেকেও। তিনি (সা.) বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াকে পছন্দ করবো না?

যখন তাঁর শরীর মোটা হয়ে যেত, এখানে লেখা রয়েছে, হতে পারে যখন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কষ্ট হতো তখন তিনি বসে নামায পড়তেন। কিন্তু বসে নামায পড়ার সময়েও, কিয়ামে তো সুরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা বসেই পড়তেন। কিন্তু যখন রুকু করতে চাইতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, এরপর রুকু করতেন।

[সহীহ আল বুখারী, কিতাব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৪৮৩৭]

আতা রেওয়াত করেন, একবার আমি, ইবনে উমর ও উবায়দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলাম আর আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে মহানবী (সা.)-এর কোন বিস্ময়কর বিষয় বলুন যা আপনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাঝে দেখেছেন। এতে তাঁর স্মরণে হযরত আয়েশা আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন। আর বলেন, মহানবী (সা.)-এর আচরণের প্রতিটি দিকই অসাধারণ ছিল। তিনি বলেন, একবারের ঘটনা, মহানবী (সা.) এক রাত আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমার সাথে বিছানায় শুলেন। তিনি (সা.) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি আজ রাতের জন্য আমাকে অনুমতি দিবে যেন আমি আমার প্রভুর ইবাদত করতে পারি? আমি বললাম, খোদার কসম! আমার তো আপনার ইচ্ছার প্রতি সম্মান ও আপনার নৈকট্য পছন্দ। আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য অনুমতি রয়েছে। তখন তিনি উঠলেন এবং পাত্র থেকে ওযু করলেন। নামাযের জন্য দাঁড়ালেন আর নামাযে এত কান্নাকাটি করলেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর বুকের ওপর পড়তে লাগলো। নামাযের পর তিনি (সা.) ডান দিকে হেলান দিয়ে এমনভাবে বসলেন যে, তাঁর ডান হাত ডান গালের নীচে ছিল আর পুনরায় কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি তাঁর অশ্রু মাটিতে পড়তে লাগলো।

এমনকি ফজরের আযান দেওয়ার পর বেলাল (রা.) আসেন। তিনি যখন তাঁকে (সা.) এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেন তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি এত বেশি কেন কাঁদছেন, যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি আল্লাহ্ তা'লার একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? আর আমি কেনই বা কাঁদবো না, কারণ আজ রাতে আমার প্রভু-প্রতিপালক এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন, আর এগুলো হলো আল-ইমরানের আয়াত।"

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۔ الَّذِیۡنَ یَذۡکُرُوۡنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰی جُنُوۡبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبۡحٰنَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ হলো :- নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে ও বসে এবং পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করে আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে), "হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! তুমি এটি অর্থাৎ (মহাবিশ্ব) বৃথা সৃষ্টি করো নি। তুমি পবিত্র। অতএব তুমি আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো। (সূরা আলে ইমরান ১৯১-১৯২) [তফসীর রূহুল বায়ান, আলে ইমরান আয়াত-১৯১-১৯২]

এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর মহানবী (সা.) বলেন, দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য যে এই আয়াতগুলো পাঠ করে কিন্তু তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না। [রুহুল মাআনি, আলে ইমরান,আয়াত: ১৯১-১৯২]

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই হাদিসটি স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আরবি শব্দগুলো হলো "আলা আকুনা আবদান শাকুরা"। মহানবী (সা.) এর কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত যে হাদিসটি রয়েছে সেখানে উল্লেখ আছে যে তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌রই কি শুধু কর্তব্য এহসানকারী হওয়া? বান্দার কি কর্তব্য নয় যে সে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। যদি মহানবী (সা.)-এর মতো একজন মানুষ সে সকল কুরবানি এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও রাতে জেগে আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা ফুলে যেতো, দিনের বেলায় তো ইবাদত করতেন আর নিজ জীবনকে যথাসম্ভব আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত বানাতেন। সেক্ষেত্রে আর কোন্ এমন মানুষ থাকতে পারে যে নিজেকে এই দায়িত্বগুলো থেকে মুক্ত বলে দাবি করতে পারবে?

[আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৩৯-৪৪০]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ও এই বিষয়ে বলেন, মহানবী (সা.) নামাযের সময় এত বেশি ক্রন্দন করতেন এবং দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর (সা.)-এর পা ফুলে যেতো। সাহাবীগণ নিবেদন করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তো আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাহলে এত কষ্ট ও কান্নাকাটি করার আর কী বা কারণ রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, আমি কি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" [মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩১]

মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা আমাদের সকলের কাছে দাবি জানায়, আমরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে নিজেদের কৃতজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাই। কৃতজ্ঞতা মানে স্থির হয়ে বসে পড়ার নাম নয়, বরং কৃতজ্ঞতা নিজ কর্মে আরো উন্নতি প্রত্যাশা করে। মহানবী (সা.) তাকওয়ার সর্বোচ্চ মানে উপনীত ছিলেন, তাই তিনি (সা.) কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ারও সর্বোচ্চ মান অর্জন করেছিলেন। আর একই সাথে আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে তোমরাও কৃতজ্ঞ বান্দাতে পরিণত হও। যদি আল্লাহ্ তা'লার একজন প্রকৃত বান্দা হওয়ার কর্তব্য পালন করতে চাও, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার ওপর যতবেশি অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন, ততই নিজ ইবাদতের মানকে উন্নত কর ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। খোদা তা'লার অনুগ্রহের ফলে অলসতা প্রদর্শন করা উচিত নয়, বরং ইবাদত ও কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে আরও বেশি অগ্রগামী হওয়া উচিত। কাজেই যতদিন আমরা এই নীতি অনুযায়ী চলব, ততদিন আমরা ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে অগ্রগতির সোপান অতিক্রম করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর ব্যাখ্যায় এক স্থানে বলেছেন, অজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে বলেছে (ফার্সি পঙক্তি) এটি একটি ফার্সি পঙক্তি। ফার্সি কবিতার এই চরণটির অর্থ হলো, তোমার অনুগ্রহই যা আমাকে ধৃষ্ট বানিয়েছে। এই কবি আল্লাহ্‌কে বলছেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আমাকে ধৃষ্ট বানিয়েছে। অথচ উচিত ছিল কৃতজ্ঞ হওয়া, কিন্তু আমি উদ্ধত হয়ে গেলাম। কেননা, এই কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কখনো মানুষকে উদ্ধত বানায় না। আর সেটি মানুষকে বিদ্রোহী বানায় না। বরং আরো বেশি কৃতজ্ঞ ও অনুগত বানিয়ে থাকে।

সুতরাং তোমরা আগের তুলনায় বেশি কৃতজ্ঞ হও। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَئِنۡ شَکَرۡتُمۡ لَاَزِیۡدَنَّکُمۡ - অর্থাৎ, তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে যদি তোমরা এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাহলে তোমাদেরকে আরো বেশি দিব। (সূরা ইবরাহীম ১৪:৮)

[সূত্র: খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬১-৩৬২]

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞ হওয়ার সৌভাগ্য দিন, প্রকৃত ইবাদতকারী হওয়ার সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন সর্বদা তাঁর অনুগ্রহ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকি। (আমিন)।

[সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল,৩০ আগস্ট, ২০২৬]

তাহরীকে জাদীদের কল্যাণ ও গুরুত্ব

পি. এম. রাশিদ, ওয়াকিলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ

আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছানুযায়ী ঠিক সেই সময়ে তহরিকে জাদিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যখন আহরারি আন্দোলন তার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আহরাররা তাদের ধারণায়, আল্লাহ না করুন, কাদিয়ান ও আহমদিয়াতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়ার বড় বড় দাবি করছিল। এমনকি আহরারি নেতাদের বক্তব্য ছিল, 'আমাদের আল্লাহ নিযুক্ত করেছেন এবং এখন আমাদের মাধ্যমে এই জামাতের সমাপ্তি ঘটবে।'

কিন্তু এই ফিতনার সূচনালগ্নেই হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের দৃঢ়সংকল্প খলিফা, আমাদের নেতা হজরত মুসলেহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আহমদিয়াতের সাফল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং হজরত ১৯৩১ সালের বার্ষিক জলসার প্রথম দিনে আহরারদের সম্বোধন করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছিলেন:

'আমরা তাদের বলি, তোমরা কী করতে পারবে? যদি তোমরা পৃথিবীর সমস্ত সরকার ও সমস্ত জাতিকে ডেকে এনে নিজেদের সঙ্গে যোগ করাও, তারপরও যদি তোমরা জয়ী হয়ে যাও, তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী। তারা যদি এমনটি করে, তাহলে তারা জানতে পারবে যে, তারা কিসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তারা যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে; আর আমরা যদি তাদের ওপর আক্রমণ করি, তাহলেও তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এটি আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত একটি জামাত এবং এটি তাঁরই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে, তিনি একে সফল করবেন। এর বিরুদ্ধে কোনো মানবশক্তিই কিছু করতে পারবে না। আমরা বলি না যে, আমরা তাদের পিষে ফেলব; কিন্তু অবশ্যই নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে বলি যে, আল্লাহ তাদের পিষে ফেলবেন। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যত বড় বাহিনী নিয়েই দাঁড়াক না কেন। ইসলামী পরিভাষায় যুদ্ধকে আগুন বলা হয়েছে এবং হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের ইলহাম হলো: "আগুন দিয়ে আমাদের ভয় দেখিয়ো না। আগুন আমাদের দাস, বরং দাসানুদাস।"'

আরও বলেন: 'অতএব আমাদের ওপর বিজয় লাভ করার চিন্তা তাদের নিছক কল্পনা ও ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের প্রত্যেককে হত্যা করে পুড়িয়ে দিলে এবং তারপর আমাদের ছাই উড়িয়ে দিলেও পৃথিবীতে আহমদিয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক মহাদেশে এটি বিস্তৃত হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে শুধু আহমদিয়াতই আহমদিয়াত দেখতে পাওয়া যাবে। এটি আল্লাহর রোপিত একটি চারাগাছ। এর বিরুদ্ধে যে জিহ্বা বাড়াবাড়ি করবে, সেই জিহ্বা কর্তিত হবে। যে হাত উঠবে, সেই হাত নামিয়ে দেওয়া হবে। যে আওয়াজ উচ্চারিত হবে, সেই আওয়াজ স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেই পদক্ষেপ রোধ করা হবে। ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান, ফরাসি-সবাই যদি একত্রিত হয়, তাহলেও মশা যেভাবে পিষে ফেলা হয়, সেভাবেই তারা পিষ্ট হবে এবং কোনো জাতিই আহমদিয়াতের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

(তারিখে আহমদিয়াত, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আহমদিয়াতের বিজয় সম্পর্কে হজরত মুসলেহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আহমদিয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে আহরারদের সমস্ত দাবি ও পরিকল্পনা ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহতালার অনুগ্রহে, উদ্দীপনাময় ও আসমানি সমর্থনপ্রাপ্ত নেতৃত্ব তথা আহমদিয়া খেলাফতের তত্ত্বাবধানে আহমদিয়াত দিন দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে।

আহরারদের দাবি এবং তার বিপরীতে আহমদিয়াতের অগ্রগতির উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের প্রিয় ইমাম, হজরত খলিফাতুল মসীহ আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ বলেন: আহরারদের যে দাবি ছিল-আমরা কাদিয়ানের ইটের ওপর ইট থাকতে দেব না, আহমদিয়াতকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব-এবং আজ পর্যন্ত আমাদের বিরোধীরাও এসব স্লোগান দিয়ে আসছে, এসব স্লোগানের জবাব প্রতি বছর জামাতের অগ্রগতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। আল্লাহতালার অনুগ্রহের মাধ্যমে দেওয়া হয়। যারা বাইআত করে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তারাই এর জবাব। আর আজ দুইশ বিশটি দেশে বিস্তৃত জামাতের অগ্রগতি তারই জবাব। দেখো! তোমরা স্লোগান দিয়েছিলে যে, আমরা একে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব; অথচ আল্লাহতালার অনুগ্রহ এমন যে, জামাত ক্রমাগত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।'

(৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবা)

১৮৯১ সালের ঘটনা। আমাদের নেতা হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামকে একটি ঈমান-উদ্দীপক কাশফি দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। এতে তাঁকে ইসলামের বিজয়ের আসমানি অভিযান সম্পন্ন করার জন্য পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি আধ্যাত্মিক বাহিনী দেওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। তহরিকে জাদিদের মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রাণের ঈর্ষণীয় আত্মত্যাগকারী প্রথম দফতরের মুজাহিদদের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

নিজের এই কাশফের উল্লেখ করে হজরত লিখেছেন:

'কাশফের অবস্থায় এই নগণ্য ব্যক্তি দেখল যে, মানুষের আকৃতিতে দুজন ব্যক্তি একটি স্থানে বসে আছে। একজন মাটির ওপর এবং অন্যজন ছাদের কাছাকাছি বসে আছে। আমি যখন মাটিতে বসে থাকা ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললাম, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন, কিন্তু সে নীরব রইল এবং কোনো উত্তর দিল না। তখন আমি ছাদের কাছাকাছি এবং আকাশের দিকে অবস্থানকারী দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে মুখ করে তাকে বললাম, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন। সে আমার কথা শুনে বলল, এক লক্ষ পাওয়া যাবে না; তবে পাঁচ হাজার সৈন্য দেওয়া হবে। তখন আমি মনে মনে বললাম, যদিও পাঁচ হাজার মানুষ অল্প, কিন্তু আল্লাহতালা চাইলে অল্প সংখ্যক লোকও অধিক সংখ্যক লোকের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। তখন আমি এই আয়াত পাঠ করলাম:

"কত অল্পসংখ্যক দল আল্লাহর অনুমতিক্রমে বৃহৎ দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে।"

(ইজালায়ে আওহাম, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৯)

হজরত আলাইহিস সালামের এই ঈমান-উদ্দীপক কাশফ এভাবে পূর্ণ হয় যে, তহরিকে জাদিদের প্রথম দফতরে ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত মুজাহিদদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারই ছিল। ইসলামের বিজয়ের এই বরকতময় আসমানি অভিযানে তাঁদের প্রাথমিক আত্মত্যাগ নিঃসন্দেহে অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। হজরত মুসলেহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বহু উপলক্ষে এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, এই কাশফের সত্যায়নকারী হলেন তহরিকে জাদিদের প্রথম উনিশ বছরের সময়কালে অন্তর্ভুক্ত সেই পাঁচ হাজার মুজাহিদ, যাঁদের প্রাথমিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রদত্ত আন্তরিক আত্মত্যাগ ইসলামের মহত্ত্ব ও গৌরবের নির্মীয়মাণ ভবনের জন্য একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তির মর্যাদা রাখে।

তহরিকে জাদিদ আলমাহর পড়া থেকে

তহরিকে জাদিদের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয়, মুসলেহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, এক স্থানে বলেন:

'মনে রেখো, এই আন্দোলন আল্লাহতালার পক্ষ থেকে। অতএব তিনি অবশ্যই একে উন্নতি দান করবেন। আর এর পথে যে বাধাগুলো থাকবে, সেগুলোও তিনি দূর করে দেবেন। যদি পৃথিবী থেকে এর উপকরণ সৃষ্টি না হয়, তাহলে আল্লাহতালা আকাশ থেকে একে বরকত দান করবেন। অতএব তারা সৌভাগ্যবান, যারা এই আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে অংশগ্রহণ করে। কারণ ইসলামের ইতিহাসে তাদের নাম সর্বদা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জীবিত থাকবে এবং আল্লাহতালার দরবারে তারা বিশেষ সম্মানের স্থান লাভ করবে। কারণ তারা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে দ্বীনের দৃঢ়তার জন্য চেষ্টা করেছে। আর তাদের সন্তানদের দায়িত্বও আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করবেন। আসমানি নূর তাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হতে থাকবে এবং পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকবে।'

(রোজানা আল-ফজল, কাদিয়ান, ৩০ নভেম্বর ১৯৩৯)

তহরিকে জাদিদের সূচনা ও এর পটভূমি

তহরিকে জাদিদের সূচনা এবং এর পটভূমি সম্পর্কে হজরত আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মসীহ আল খামিস আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ, ৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রদত্ত তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জুমার খুতবায় বলেন:

হজরত মুসলেহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তহরিকে জাদিদ শুরু করেছিলেন মূলত এ কারণে যে, জামাতের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে অশান্তি ও বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। এমনকি সরকারের কর্মকর্তারাও বিরোধিতাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। তহরিকে জাদিদের উদ্দেশ্যই ছিল প্রচারের মাধ্যমে জামাতকে সম্প্রসারিত করা এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশে জামাতে আহমদিয়ার মাধ্যমে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, জামাতের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষত আহরাররা অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল এবং তাদের স্লোগান ছিল যে, আমরা আহমদিয়াতকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব, কাদিয়ানের নাম ও চিহ্ন মুছে দেব এবং কাদিয়ানের ইটের ওপর ইট থাকতে দেব না। এমনকি হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের সমাধি ও পবিত্র স্থানগুলোর অবমাননার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও বিরোধীদের প্রতি অধিকতর সমর্থনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। যদিও সে সময় ব্রিটিশ সরকার ছিল, তবুও ফিতনা বন্ধ করার পরিবর্তে তাদের সমর্থন করা হচ্ছিল। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়...)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২৩)

আমেরিকা জামাতে আহমদিয়ার জাতীয় আমেলার হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ

কার্যসূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায় হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয মিটিং রুমে তশরিফ আনেন এবং আমেরিকা জামাতে আহমদিয়ার জাতীয় মজলিসে আমেলার সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়।

হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয দোয়ার মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা করেন। হুযুর আনওয়ার বলেন, সদ্য নির্বাচিত সকল কর্মকর্তার জন্য একটি শপথনামা রয়েছে। আমীর সাহেব এটি পাঠ করবেন এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা আমীর সাহেবের পিছনে পিছনে তা পাঠ করবেন। এরপর সকল কর্মকর্তা এই শপথনামায় স্বাক্ষর করবেন।

এরপর আমীর সাহেব আমেরিকা নিম্নলিখিত শপথনামা পাঠ করেন এবং তাঁর পিছনে সকল কর্মকর্তা শপথনামার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেন:

আমি আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা উপস্থিত ও পর্যবেক্ষক জেনে এই অঙ্গীকার করছি যে-

(১) জামাতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে কাজ আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তা পূর্ণ পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব।

(২) আমি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বিশ্বস্ততা বজায় রাখব এবং সর্বদা খেলাফত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।

(৩) খেলাফত ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ ও সংরক্ষণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা-সংগ্রাম করে যাব এবং আমার সন্তানদেরও সর্বদা খেলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার এবং এর বরকতসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার উপদেশ দিতে থাকব।

(৪) আমি জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে বিনয় ও সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করব। তাদের প্রকৃত কল্যাণকামী হব। তদুপরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে সর্বদা ন্যায়ের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব।

(৫) আহমদিয়া জামাতের সম্পদ সংরক্ষণ করা আমার দায়িত্ব হবে। জামাতের অর্থ অত্যন্ত সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যয় করা হবে।

(৬) আমেলার সভার কার্যবিবরণী এবং জামাতের সদস্যদের ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ সর্বদা গোপনীয়তার সঙ্গে এবং আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করব।

(৭) আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করব এবং আমার অধীনস্থদের সঙ্গে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের আচরণ করব।

(৮) আমি খলিফাতুল মসীহের সর্বদা সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত থাকব এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সর্বদা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয বলেন, প্রত্যেক জামাতের প্রত্যেক আমেলা সদস্যও এই শপথনামা পাঠ করে স্বাক্ষর করবেন।

হুযুর আনওয়ার বলেন, স্থানীয় পর্যায়েও যখন কর্মকর্তারা এই শপথনামা পাঠ করে স্বাক্ষর করবেন, তখনও এর মাধ্যমে উপকার হবে। প্রকৃতপক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিল যে, সদর আনজুমান আহমদিয়ার সদস্য ও কর্মকর্তাদের জন্য একটি শপথনামা থাকা উচিত। কিন্তু কোনো কারণে সে সময় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রহমতুল্লাহি আলাইহির যুগে একটি শপথনামার শব্দাবলি অনুমোদিত হয়েছিল। তখনও তা বাস্তবায়নের জন্য জামাতগুলোর কাছে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এখন এতে কিছু সামান্য পরিবর্তন করে আমি জামাতগুলোতে পাঠিয়েছি। আমার ধারণা, এর মাধ্যমে সাহায্য হবে। মানুষ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে, খেলাফতের সঙ্গে করা অঙ্গীকারের অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের পদমর্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

তাহরীকে জাদীদ

পরবর্তীতে হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জাতীয় তাহরীকে জাদীদ সচিব নিবেদন করেন যে, গত বছর মোট চাঁদার পরিমাণ ছিল ২.৭ মিলিয়ন ডলার।

হুযুর আনওয়ার বলেন, আনসারুল্লাহ আমাকে জানিয়েছে যে, তারা তাহরীকে জাদীদে ১.২ মিলিয়ন ডলার জমা করেছে। এর অর্থ কি এই যে, লাজনা ও খুদ্দাম মাত্র ১.৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে?

হুযুর আনওয়ার বলেন, আপনাদের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ লাজনা সদস্য উপার্জনকারী সদস্য। অতএব তাদের পক্ষ থেকে আরও বেশি ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। সাধারণভাবে অধীনস্থ সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রত্যেক সংগঠনের মোট চাঁদার এক-তৃতীয়াংশ অংশ থাকে।

জাতীয় তাহরীকে জাদীদ সচিব নিবেদন করেন যে, গত বছর লাজনা এক মিলিয়ন ডলার জমা করেছে। এর পর হুযুর আনওয়ার বলেন, এর অর্থ কি এই যে, ১.৫ মিলিয়ন ডলার আনসারুল্লাহর অংশ ছিল, ১ মিলিয়ন লাজনা ইমায়িল্লাহর এবং খুদ্দামুল আহমদিয়া মাত্র ৫ লক্ষ ডলার জমা করেছে?

এরপর সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়া নিবেদন করেন যে, আমরা সত্যিই পিছিয়ে আছি। হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সদর সাহেব নিবেদন করেন যে, তারা জায়ন মসজিদের জন্য এক লক্ষ ডলার প্রদান করেছিলেন।

এরপর হুযুর আনওয়ার বলেন, লাজনা ইমায়িল্লাহ এই মসজিদের জন্য ১.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে, যদিও তারা তাহরীকে জাদীদেও এক মিলিয়ন ডলারের ত্যাগ স্বীকার করেছে।

হুযুর আনওয়ার বলেন, অন্যান্য দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও কানাডায় এই আন্দোলনগুলোতে, অর্থাৎ ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদে জমা হওয়া মোট অর্থের এক-তৃতীয়াংশ খুদ্দামুল আহমদিয়ার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব খুদ্দামুল আহমদিয়ার এতে এগিয়ে আসা উচিত, পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জাতীয় তাহরীকে জাদীদ সচিব নিবেদন করেন যে, এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩.২ মিলিয়ন। ইনশাআল্লাহ আমরা এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারব। আমরা এর জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছি। দুই মিলিয়ন জমা হয়ে গেছে এবং অবশিষ্টটিও ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। হুযুরের দোয়া প্রয়োজন।

হুযুর আনওয়ার বলেন, এখন তো বছর শেষ হতে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। দোয়া তো আমরা করি, কিন্তু আপনাদের পরিশ্রমও করতে হবে।

হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জাতীয় তাহরীকে জাদীদ সচিব নিবেদন করেন যে, আমেরিকার মোট তানযীম সংখ্যা ২২,৫৫০।

হুযুর আনওয়ার বলেন, যুক্তরাজ্য জামাতের তানযীম প্রায় ৪০ হাজার। এর মধ্যে ১৫ হাজার লাজনার তানযীম। এখানে আমেরিকায় ৮ হাজার লাজনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের লাজনারা খুব বেশি বেতনের চাকরিও করেন না। কয়েকজন যদি করেও থাকেন, তাঁরা ছোটখাটো চাকরি করেন এবং তাঁরা গত বছর প্রায় ৮ লক্ষ পাউন্ডের কাছাকাছি প্রদান করেছেন। এখানে আমেরিকায় আপনাদের উপার্জনকারী সদস্যদের মধ্যে ৩০ শতাংশ লাজনা সদস্য। আর তাদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যক নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁদের বেশ ভালো চাকরি রয়েছে। অতএব আপনারা তাঁদের উৎসাহিত করলে তাঁরা অবশ্যই প্রদান করবেন।

ওসিয়ত বিভাগ

পরবর্তীতে জাতীয় ওসিয়ত সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজের রিপোর্ট পেশ করে তিনি নিবেদন করেন যে, উপার্জনকারী সদস্যদের মধ্যে ৫০ শতাংশ সদস্যের ওসিয়তের লক্ষ্যমাত্রা এখনও পূর্ণ হয়নি। এখন পর্যন্ত ৩১ শতাংশ উপার্জনকারী সদস্য ওসিয়ত করেছেন।

হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে ওসিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, মুসিয়ানের মোট সংখ্যা ৩৯৫৯। আর উপার্জনকারীদের মোট সংখ্যা ৮২৩০ এবং তাঁদের মধ্যে ২৫৭৯ জন মুসিয়ান।

হুযুর আনওয়ার বলেন, লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আপনাদের এখনও ১৯ শতাংশ অতিরিক্ত মুসিয়ান তৈরি করতে হবে। এর জন্য আপনারা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

এর উত্তরে ওসিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, আমরা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করছি। একইভাবে ওয়েবিনার ও সেমিনারের আয়োজন করছি এবং মুবাল্লিগদের সাহায্যেও যোগাযোগ করছি।

এরপর হুযুর আনওয়ার বলেন, আপনাদের অধীনস্থ সংগঠনগুলোর কাছ থেকেও সাহায্য নেওয়া উচিত। আনসার, লাজনা ও খুদ্দামের কাছ থেকেও সহযোগিতা নিন। সংগঠনগুলোও ওসিয়তের জন্য সহকারী সভাপতি নিয়োগ করেছে। তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিন।

তরবিয়ত বিভাগ

এরপর নায়েবে আমীর ও জাতীয় তরবিয়ত সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বলেন, আপনাদের মোট তানযীম ২২,৫৫০। এর মধ্যে প্রায় ৮,২০০ জন উপার্জনকারী। অতএব প্রায় ১৫ হাজার সদস্যের বয়স ১২ বছরের উর্ধ্বে হবে। এই ১৫ হাজারের মধ্যে কতজন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন?

জাতীয় তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন, আমাদের প্রধান মনোযোগ নামাজ, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং হুযুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলার খুতবা শোনার দিকে থাকে। আমরা যে পূর্ববর্তী জরিপ করেছিলাম, তাতে ৬১ শতাংশ মানুষ নামাজ আদায় করেন।

হুযুর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, জরিপ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা ছিল ৭,৫৯৯।

শেষাংশ ১২ পাতায়....

سیرت خاتم النبیین ﷺ

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

জায়েদ ইবনে হারিসার মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যে আগমন

হযরত খাদিজা (রা.)-এর একজন ভাতিজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হাকিম ইবনে হিযাম। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সবসময় বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। একবার তিনি কোথাও ব্যবসার উদ্দেশ্যে গেলে কয়েকজন দাস ক্রয় করে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের মধ্যে একজনকে তাঁর ফুফুর জন্য উপহার দেন। তাঁর নাম ছিল জায়েদ ইবনে হারিসা। জায়েদ মূলত একটি স্বাধীন পরিবারের সন্তান ছিলেন; কিন্তু কোনো এক লুণ্ঠনের ঘটনায় বন্দী হয়ে তাঁকে দাস বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। হযরত খাদিজা (রা.) জায়েদকে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান বালক হিসেবে দেখতে পেয়ে তাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অর্পণ করে দেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বদা এই রীতি ছিল যে, তিনি তাঁর দাস ও সেবকদের অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে রাখতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়দের মতো আচরণ করতেন। ফলে জায়েদের প্রতিও তাঁর ভালোবাসা ছিল। আর জায়েদের হৃদয় যেহেতু বিশ্বস্ত ছিল, তাই তাঁরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়ে গেল।

সেই সময় জায়েদের পিতা হারিসা এবং তাঁর চাচা কাব জায়েদের সন্ধান করতে করতে মক্কায় এসে পৌঁছান এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করেন যে, জায়েদকে মুক্ত করে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, জায়েদ যদি যেতে চায়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হলো।"

এরপর জায়েদকে ডেকে আনা হলো এবং তিনি তাঁকে বললেন, "জায়েদ! তুমি কি এঁদের চেনো যে, এঁরা কে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ইনি আমার পিতা এবং ইনি আমার চাচা।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন। তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হলো।"

জায়েদ উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে ছেড়ে কখনোই যাব না। আপনি আমার কাছে আমার চাচা ও পিতার চেয়েও অধিক প্রিয়।"

জায়েদের পিতা রাগ করে বললেন, "কী! তুমি কি দাসত্বকে স্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছ?

জায়েদ বললেন, "হ্যাঁ! কারণ আমি তাঁর মধ্যে এমন সব গুণ দেখেছি যে, এখন আমি তাঁর ওপর অন্য কাউকে কোনোভাবেই প্রাধান্য দিতে পারি না।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েদের এই উত্তর শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে কাবা শরিফের কাছে নিয়ে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, "হে লোকেরা! তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আজ থেকে আমি জায়েদকে মুক্ত করে দিলাম এবং তাকে আমার পুত্র বানালাম। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী হব।"

জায়েদের পিতা ও চাচা এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং জায়েদকে আনন্দের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে রেখে চলে গেলেন। সেই দিন থেকে জায়েদ ইবনে হারিসার পরিবর্তে জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ নামে পরিচিত হতে লাগলেন।

কিন্তু হিজরতের পর যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হলো যে, মুখে-পোষ্য পুত্র গ্রহণ করা বৈধ নয়, তখন পুনরায় জায়েদকে জায়েদ ইবনে হারিসা বলা হতে লাগল। কিন্তু এই বিশ্বস্ত সেবকের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও ভালোবাসা আগের মতোই রয়ে গেল; বরং দিন দিন তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল।

জায়েদের ইন্তেকালের পর জায়েদের পুত্র উসামা ইবনে জায়েদের প্রতিও- যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবিকা উম্মে আইমানের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন-তাঁর একই রকম আচরণ ও ভালোবাসা ছিল।

জায়েদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, সমস্ত সাহাবির মধ্যে একমাত্র তাঁরই নাম পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলী ইবনে আবি তালিবের মহানবী (সা.)-এর গৃহে আগমন

আবু তালিব অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তাঁর সংসার চলত। বিশেষত সেই দিনগুলোতে, যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তাঁর দিনগুলো অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হতো।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর চাচার এই কষ্ট দেখতে পেলেন, তখন একদিন তাঁর অন্য চাচা আব্বাসকে বললেন, "চাচা! আপনার ভাই আবু তালিবের জীবিকা অত্যন্ত সংকীর্ণ। কতই না ভালো হয়, যদি আপনি তাঁর পুত্রদের মধ্য থেকে একজনকে আপনার বাড়িতে নিয়ে নেন এবং আমি একজনকে আমার কাছে নিয়ে আসি।"

আব্বাস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এরপর তাঁরা দুজন একসঙ্গে আবু তালিবের কাছে গেলেন এবং তাঁর সামনে এই আবেদন পেশ করলেন। আবু তালিব তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকীলকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বললেন, "আকীলকে আমার কাছে থাকতে দাও এবং বাকিদের মধ্যে যাকে তোমরা নিতে চাও, নিয়ে যাও।"

অতঃপর জাফরকে আব্বাস তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং আলী (রা.)-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাছে নিয়ে এলেন। সেই সময় হযরত আলী (রা.)-এর বয়স প্রায় ছয়-সাত বছর ছিল। এরপর থেকে আলী (রা.) সর্বদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই থাকতেন।

প্রত্যুষের শুভ্রতা

এখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স প্রায় চল্লিশ বছরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেই সময় এসে গিয়েছিল, যখন পূর্ব দিগন্তে প্রত্যুষের শুভ্রতা প্রকাশিত হওয়ার কথা।

যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই মক্কার সাধারণ সমাজে খুব বেশি মেলামেশা করতেন না, কিন্তু এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে তাঁর মানসিক অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি দিনরাত আল্লাহ্ তা'আলার সন্ধান এবং তাঁর স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন।

মক্কার কাছে, শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে মিনার দিকে যেতে বাম পাশে হেরা পর্বতে একটি গুহা রয়েছে, যাকে হেরা গুহা বলা হয়। এই দিনগুলোতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ নিয়ম ছিল সেখানে যাওয়া এবং চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত থাকা। সাধারণত তিনি কয়েক দিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং শহরে ফিরে আসতেন না। কখনো কখনো হযরত খাদিজা (রা.)-ও তাঁর সঙ্গে যেতেন।

এটাই সেই সময়, যাকে পবিত্র কুরআনে সত্যের অনুসন্ধানের সময় বলা হয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

"অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর সন্ধানে পথহারা ও বিস্মিত অবস্থায় পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তোমাকে তাঁর দিকে আসার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।"

এই সময় সৎ স্বপ্নের সূচনা হয়, যার সময়কাল ছয় মাস বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি যেন নবুওয়তের প্রাথমিক সিঁড়ি ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন:

"ওহির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে বিষয়টির সূচনা হয়েছিল, তা ছিল নিদ্রার মধ্যে সৎ স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রত্যুষের শুভ্রতার মতোই বাস্তবায়িত হতো। আর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হেরা গুহায় গিয়ে সেখানে একাধিক রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। এরপর পরিবারের কাছে ফিরে আসতেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয়ে গেলে আবার হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছে ফিরে এসে অনুরূপ খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে চলতে থাকে, অবশেষে তিনি যখন হেরা গুহায় ছিলেন, তখন তাঁর কাছে সত্য এসে পৌঁছায়।"

অর্থাৎ শুরুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে রূপে ওহির সূচনা হয়েছিল, তা ছিল সৎ স্বপ্নের মাধ্যমে, যা তিনি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতেন। তিনি যে প্রত্যেকটি স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রত্যুষের শুভ্রতার মতোই বাস্তবায়িত হতো।

এই সময়ে তাঁর কাছে নির্জন ও একাকী অবস্থান অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি হেরা গুহায় যেতেন এবং সেখানে একাধিক রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। এরপর বাড়িতে ফিরে আসতেন এবং সঙ্গে আরও কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে তা নিয়ে যেতেন। "তিনি (সা.) এই অবস্থাতেই ছিলেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য এসে পৌঁছাল। তখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন।"

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহতা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, ঘটনাটি সম্ভবত ১৮৮৪ সালের। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ মে-জুনের সময়, হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম মসজিদ মুবারকে ফজরের নামাজ আদায় করার পর তার সংলগ্ন একটি গোসলখানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। গোসলখানাটি সদ্য প্লাস্টার করা হওয়ায় বেশ ঠান্ডা ছিল। সেখানে একটি চারপাই পাতা থাকত; হজরত সেই চারপাইয়ের ওপরই শুয়ে পড়েন। চারপাইয়ের ওপর কোনো বিছানা, বালিশ ইত্যাদি ছিল না। হজরতের মাথা ছিল কিবলার দিকে এবং মুখ উত্তর দিকে। তিনি একটি কনুই মাথার নিচে বালিশের মতো করে রাখলেন এবং অপর কনুইটিও একইভাবে মাথার ওপর রাখলেন। আমি তাঁর পা টিপতে বসে গেলাম।

সেটি ছিল রমজান মাসের সাতাশ তারিখ এবং শুক্রবার। তাই মনে মনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম যে, আমার জন্য এমন সব বরকতময় সুযোগ একই সঙ্গে একত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ, আমি হজরত সাহেবের মতো একজন বরকতময় ব্যক্তির সেবা করছি; সময় ফজরের, যা একটি বরকতময় সময়; মাস রমজানের, যা একটি বরকতময় মাস; তারিখ সাতাশ এবং দিন শুক্রবার। তার ওপর পূর্ববর্তী রাত ছিল শবে কদর। কারণ আমি হজরত সাহেবের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, রমজানের সাতাশ তারিখ যদি শুক্রবারের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে সেই রাত নিশ্চিতভাবেই শবে কদর হয়।

আমি এসব বিষয় চিন্তা করে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম। এমন সময় হজরত সাহেবের শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। এরপর হজরত ধীরে ধীরে নিজের মাথার ওপর রাখা কনুইটি সামান্য সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তখন আমি দেখলাম, হজরত সাহেবের চোখ অশ্রুসজল হয়ে আছে।এরপর তিনি আবার আগের মতো কনুইটি রেখে দিলেন।

আমি পা টিপতে টিপতে হজরত সাহেবের পায়ের পেশির কাছে পৌঁছলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, গোড়ালির নিচে তাঁর পায়ের একটি শক্ত স্থান ছিল। তার ওপর লাল রঙের একটি ফোঁটা পড়েছিল, যা সদ্য পড়ার কারণে তখনও ভেজা ছিল। আমি ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেটি স্পর্শ করে দেখলাম, ব্যাপারটি কী। এতে ফোঁটাটি গোড়ালির ওপরও ছড়িয়ে গেল এবং আমার আঙুলেও লেগে গেল। এরপর আমি সেটি শুঁকে দেখলাম, হয়তো এর মধ্যে কোনো সুগন্ধ রয়েছে। কিন্তু কোনো সুগন্ধ পেলাম না। আমি এটি এজন্য শুঁকেছিলাম যে, সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, এটি আল্লাহতালার পক্ষ থেকে কোনো বিষয়; অতএব এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো সুগন্ধ থাকবে।

এরপর পা টিপতে টিপতে যখন পাঁজরের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, একই লাল রঙের আরও একটি বড় ফোঁটা তাঁর কুর্তার ওপর পড়ে আছে। সেটিও স্পর্শ করে দেখলাম, সেটিও ভেজা। তখন আবার আমার মনে বিস্ময় জাগল যে, এই লাল রঙের ফোঁটা কোথা থেকে এল।

এরপর আমি খুব ধীরে চারপাই থেকে উঠে দাঁড়ালাম, যাতে হজরত সাহেবের ঘুম না ভাঙে। তারপর খুঁজে দেখতে লাগলাম, এই লাল রঙের ফোঁটা কোথা থেকে পড়েছে। ঘরটি ছিল অত্যন্ত ছোট। আমি ছাদের চারপাশ ভালোভাবে অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু বাইরে থেকে এর কোনো উৎসের সন্ধান পেলাম না। আমার মনে এ কথাও এলো যে, হয়তো ছাদের ওপর কোনো টিকটিকির লেজ কেটে গিয়ে তার রক্ত নিচে পড়েছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছাদের দিকে তাকালাম; কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম এবং আগের মতোই পা টিপতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হজরত সাহেব উঠে বসলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গিয়ে বসলেন। আমি তাঁর পেছনে বসে কাঁধ টিপতে লাগলাম।

তখন আমি আরজ করলাম, 'হুজুর, এই লাল রং আপনার ওপর কোথা থেকে পড়ল?' হজরত অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আমের রস হবে', এবং আমাকে এড়িয়ে গেলেন।

আমি আবার আরজ করলাম, 'হুজুর, এটি আমের রস নয়; এটি তো লাল রং।'

এতে তিনি পবিত্র মাথাটি সামান্য নাড়িয়ে বললেন, 'কোথায় আছে?'

আমি কুর্তার ওপর সেই চিহ্নটি দেখিয়ে বললাম, 'এই যে।'

তখন হজরত কুর্তাটি সামনের দিকে টেনে নিয়ে মাথাটি সেদিকে ঘুরিয়ে সেই ফোঁটাটি দেখলেন। এরপর এ বিষয়ে আমাকে আর কিছু বললেন না। বরং আল্লাহতালার দর্শন এবং কাশফের বিষয়সমূহের বাহ্যিক জগতে প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী কয়েকজন বুযুর্গের এক-দুটি ঘটনা আমাকে শোনালেন এবং বললেন, 'আল্লাহতালার সত্তা সকল দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে। এই পার্থিব চোখ তাঁকে দুনিয়াতে দেখতে পারে না। তবে তাঁর কোনো কোনো সৌন্দর্যময় বা মহিমাময় গুণ বিশেষ আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে বুযুর্গদের কাছে দৃশ্যমান হয়।'

শাহ আবদুল কাদির সাহেব লিখেছেন যে, তিনি বহুবার আল্লাহতালার দর্শন তাঁর পিতার আকৃতিতে লাভ করেছেন। আরও শাহ সাহেব বলেন, একবার তিনি আল্লাহতালার দর্শন লাভ করেন এবং আল্লাহতালা তাঁকে হলুদের একটি গাঁট দিয়ে বলেন, 'এটি আমার মারিফত; এটিকে সংরক্ষণ করে রেখো।' তিনি যখন জাগ্রত হলেন, তখন দেখলেন, হলুদের সেই গাঁটটি তাঁর মুঠোর মধ্যেই রয়েছে।

আর একজন বুযুর্গ, যাঁর নাম হজরত উল্লেখ করেননি, তাহাজ্জুদের সময় তাঁর কক্ষে বসে মুসাল্লার ওপর কিছু পাঠ করছিলেন। তিনি কাশফের অবস্থায় দেখলেন, বাইরে থেকে একজন ব্যক্তি এসে তাঁর নিচে বিছানো মুসাল্লাটি বের করে নিয়ে গেল। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন দেখলেন, সত্যিই তাঁর নিচে মুসাল্লাটি নেই। দিনের আলো ফুটলে তিনি কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, মুসাল্লাটি উঠানে পড়ে আছে।

এই ঘটনাগুলো শোনানোর পর হজরত সাহেব বললেন, 'এগুলো ছিল কাশফের বিষয়। কিন্তু আল্লাহতালা এই বুযুর্গদের কারামত প্রকাশ করার জন্য বাহ্যিক জগতেও সেগুলোর অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

'এখন আমাদের ঘটনা শোনো। যখন তুমি কক্ষে আমার পা টিপছিলে, তখন আমি দেখতে পেলাম, একটি অত্যন্ত প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন স্থান। সেখানে একটি পালঙ্ক পাতা রয়েছে এবং তার ওপর একজন শাসকের আকৃতির ব্যক্তি বসে আছেন। আমার অন্তরে এই কথা সঞ্চারিত করা হলো যে, ইনি আহকামুল হাকিমীন, অর্থাৎ রব্বুল আলামীন। আর আমি নিজেকে এমন মনে করছিলাম, যেমন কোনো শাসকের ঘনিষ্ঠ কোনো কর্মচারী বা দপ্তরের কর্মকর্তা হয়ে থাকে।

'আমি তাকদির ও বিধানসংক্রান্ত কিছু হুকুম লিখেছি এবং তাতে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেগুলো তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সঙ্গে আমাকে নিজের পাশে পালঙ্কের ওপর বসিয়ে নিলেন। তখন আমার এমন অবস্থা হলো, যেন কোনো পুত্র বহু বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর তার পিতার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; অথবা সম্ভবত তিনি বলেছেন, তার হৃদয়ে গভীর আবেগের সঞ্চার হয়েছে। তখন আমার মনে এ কথাও এলো যে, তিনি আহকামুল হাকিমীন-অথবা তিনি বলেছেন, রব্বুল আলামীন-এবং কী অপরিসীম ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে তিনি আমাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিয়েছেন।

'এরপর আমি যে হুকুমগুলো লিখেছিলাম, সেগুলোতে স্বাক্ষর করানোর উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি পাশে রাখা লাল কালির দোয়াতে কলম ডুবিয়ে আমার দিকে ঝেড়ে স্বাক্ষর করে দিলেন।'

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, হজরত সাহেব কলম ঝাড়া এবং স্বাক্ষর করার ভঙ্গিগুলো নিজের হাতের নড়াচড়ার মাধ্যমে আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি এভাবেই করেছিলেন।

এরপর হজরত সাহেব বললেন, 'এই সেই লাল রং, যা ওই কলম থেকে বের হয়েছিল।'

তারপর বললেন, 'দেখো, তোমার ওপরও কোনো ফোঁটা পড়েছিল কি না।'

আমি আমার কুর্তার এদিক-ওদিক দেখে আরজ করলাম, 'হুজুর, আমার ওপর তো কোনো ফোঁটা পড়েনি।'

তিনি বললেন, 'তুমি তোমার টুপির ওপর দেখো।'

সেই সময় আমার মাথায় মসলিনের সাদা টুপি থাকত। আমি টুপিটি খুলে দেখলাম, তাতেও একটি ফোঁটা রয়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং আরজ করলাম, 'হুজুর, আমার টুপিতেও একটি ফোঁটা রয়েছে।'

এরপর আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, এই কুর্তাটি অত্যন্ত বরকতময়; এটিকে তাবাররুক হিসেবে নিজের কাছে রাখা উচিত।

প্রথমে আমি এই আশঙ্কায় যে, হজরত যেন সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার না করে দেন, তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুজুর, কোনো বুযুর্গের কোনো তাবাররুক, যেমন কাপড় ইত্যাদি, নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখা কি জায়েজ?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, জায়েজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুক সাহাবিরা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।'

তারপর আমি আরজ করলাম, 'হুজুর, আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমার একটি প্রশ্ন আছে।' তিনি বললেন, 'বলো, কী?' আমি আরজ করলাম, 'হুজুর, এই কুর্তাটি তাবাররুক হিসেবে আমাকে দিয়ে দিন।' তিনি বললেন, 'না, এটি তো আমরা দিই না।' আমি আরজ করলাম, 'হুজুর, আপনি তো এইমাত্র বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুক সাহাবিরা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।'

এতে তিনি বললেন, 'মিয়া আবদুল্লাহ, প্রকৃত বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব তাবাররুক যে সকল সাহাবির কাছে ছিল, তাঁরা মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, সেই তাবাররুকগুলো যেন তাঁদের কাফনের সঙ্গে দাফন করে দেওয়া হয়। অতএব সেভাবেই করা হয়েছিল। যে তাবাররুক যে সাহাবির কাছে ছিল, তা তাঁর কাফনের সঙ্গে দাফন করে দেওয়া হয়েছিল।'

শেষাংশ ১২ পাতায়....

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 1 Oct, 2026 Issue No.40

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১১ পাতার পর.....

আমি আরজ করলাম, 'হুজুর, আমিও মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যাব যে, এই কুর্তাটি যেন আমার কাফনের সঙ্গে দাফন করে দেওয়া হয়।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যদি এই অঙ্গীকার করো, তাহলে নিয়ে নাও।'

সেদিন যেহেতু শুক্রবার ছিল, কিছুক্ষণ পর হজরত গোসল করে পোশাক পরিবর্তন করলেন এবং আমি কুর্তাটি নিজের কাছে রেখে দিলাম।

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, তখনও হজরত সেই কুর্তাটি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় আশপাশ থেকে আগত দুই-তিনজন অতিথির কাছে আমি এই চিহ্নটির কথা উল্লেখ করলাম। তাঁরা পরে হজরত সাহেবের কাছে এসে আরজ করলেন, 'মিয়া আবদুল্লাহ আমাদের কাছে এমন কথা বলেছেন।'

হজরত বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

এরপর তাঁরা বললেন, 'হুজুর, এই কুর্তাটি আমাদের দিয়ে দিন। আমরা সবাই এর অংশ ভাগ করে নেব; কারণ এতে আমাদের সবার অধিকার রয়েছে।'

হজরত সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়ে নিও।'

তিনি তাঁদের কাছ থেকে কোনো শর্ত বা অঙ্গীকারও গ্রহণ করলেন না।

এতে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এই চিহ্নটি আমার হাত থেকে চলে গেল। আমার মনে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি হলো। তাই আমি হজরত সাহেবের কাছে আরজ করলাম, 'হুজুর, এই কুর্তার ওপর আপনার আর কোনো অধিকার নেই; কারণ এটি এখন আমার মালিকানায় চলে এসেছে। এর ওপর আমারই অধিকার রয়েছে। আমি তাঁদের দেব কি দেব না, তা আমার ব্যাপার। কারণ আমি এটি হুজুরের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিয়েছি।'

তখন হজরত মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, মিয়া আবদুল্লাহ, এটি তো আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন। এখন এর ব্যাপারে আপনারই অধিকার; আপনি তাঁদের দেবেন কি দেবেন না, তা আপনার ব্যাপার।'

এরপর তাঁরা আমার কাছে অত্যন্ত অনুরোধ করে কুর্তাটি চাইলেন, কিন্তু আমি দিতে অস্বীকার করলাম।

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, আজ পর্যন্ত সেই কুর্তার ওপর লাল রঙের দাগগুলো ঠিক একইভাবে বিদ্যমান রয়েছে; তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর এই কুর্তার কাপড়কে পাঞ্জাবি ভাষায় 'নীনো' বলা হয়।

এই কুর্তাটি হজরত সাত দিন ধরে পরেছিলেন।

আমি প্রথমদিকে এই কুর্তাটি লোকদের দেখাতাম না। কারণ হজরতের এই কথাগুলো আমার মনে গেঁথে ছিল যে, 'এই কুর্তাটিকে যেন জিয়ারতের বস্তুতে পরিণত করা না হয়।' কিন্তু লোকেরা এটি দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করত এবং আমাকে দেখানোর জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

আমি হজরত খলিফাতুস সানির কাছে বিষয়টি উল্লেখ করে বললাম, 'হজরত সাহেবের কথার কারণে এই কুর্তাটি লোকদের দেখাতে আমার অনীহা হয়; কিন্তু মানুষ আমাকে খুব বিরক্ত করছে। এখন কী করা উচিত?'

হজরত মিয়া সাহেব বললেন, 'এটি অনেক বেশি দেখাও এবং ব্যাপকভাবে দেখাও, যাতে এর দর্শনের সাক্ষী অনেক সৃষ্টি হয় এবং আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে পারে, "আমিও দেখেছি, আমিও দেখেছি, আমিও দেখেছি।"' অথবা সম্ভবত 'আমি'-এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

এরপর থেকে আমি কুর্তাটি দেখাতে শুরু করলাম। তবে এখনও কেবল সেই ব্যক্তিকেই দেখাই, যিনি নিজে এটি দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজে থেকে কাউকে দেখাতে আমার অনীহা হয়; কারণ হজরত সাহেবের সেই কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত রয়েছে।

আর প্রত্যেক সফরেই আমি কুর্তাটি সঙ্গে রাখি এই চিন্তায় যে, কে জানে কোথায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এই নগণ্য ব্যক্তি আরজ করে যে, আমি এই কুর্তাটি দেখেছি। তাতে লাল রঙের দাগটি হালকা, অর্থাৎ গোলাপি বর্ণের মতো। আর মিয়া আবদুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, শুরু থেকেই এর রং এমনই রয়েছে।

এছাড়াও দেখুন, বর্ণনা নম্বর ৪৩৬।

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রায়ে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Seth Shamshuddin sb., Barisha (Kolkata)

২ পাতার পর.....

তিনি বলেন,

"সর্বদা দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রগতি লাভ করেছি। এর মানদণ্ড হলো কুরআন। আল্লাহ্‌তাআলা মুত্তাকির নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিও একটি নিদর্শন রেখেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকিকে পার্থিব অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে তাঁর কার্য্যাবলির নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্?তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ্?তাআলা তার জন্য প্রত্যেক বিপদের মধ্যে মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার জন্য এমন রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, যার কথা তার ধারণাতেও থাকে না।

তিনি বলেন, "এমন মনে করো না যে, আল্লাহ্?তাআলা দুর্বল; তিনি মহাশক্তির অধিকারী। কোনো বিষয়ে যখন তাঁর ওপর ভরসা করবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্?তাআলার ওপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।"

এক স্থানে তিনি বলেন, "সকলের মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। পূর্ণ মনোযোগ ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে শোনো, কারণ এটি ঈমানের বিষয়। এতে অলসতা, অবহেলা ও অমনোযোগ অত্যন্ত খারাপ ফল সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের ব্যাপারে অবহেলা করে এবং তাদের উদ্দেশে যখন কোনো কথা বলা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনে না, তাদের বক্তার বক্তব্য থেকে-তা যত উচ্চমানের, উপকারী ও প্রভাবশালীই হোক না কেন-কোনো উপকার হয় না।"

হুযূর আনওয়ার বলেন, অতএব আমাদের জলসা আয়োজনের তখনই উপকার হতে পারে, যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার নবায়ন করার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হই এবং এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা এখান থেকে নেকি ও তাকওয়ার ওপর আমলকারী হয়ে বের হব।

তিনি বলেন, বিশেষভাবে আমাদের জামাআতের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতেও যে, তারা এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার দাবি করেছেন; যাতে তারা যে ধরনের বিদ্বেষ, হিংসা বা শিরকেই আক্রান্ত হয়ে থাকুক না কেন, অথবা যতই পার্থিবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকুক না কেন, এসব সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

পরিশেষে হুযূর আনওয়ার বলেন,

"এই দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন। নিজেদের জন্য, জামাআতের জন্য এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের জন্যও অধিক দোয়া করুন।

আল্লাহ্‌তাআলা তাদের নিজ পরিচয় লাভের তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরও যেন প্রচারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার এবং তাকওয়ার পথে চলতে চলতে তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন।"

৯ পাতার পর.....

এরপর হুযূর আনওয়ার বলেন, মোট তানযীম ২২ হাজার এবং এর মধ্যে প্রায় ৭ হাজার নামাজ আদায় করেন, এটি তো প্রায় ৩০ শতাংশ হয়। যদি যাদের ওপর নামাজ ফরজ হয়েছে তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার হয়, তাহলে সম্ভবত ৬০ শতাংশের পরিসংখ্যানটি সঠিকই।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, মহামারি শুরু হওয়ার আগে ২৮২টি নামাজ কেন্দ্র ছিল। মহামারির কারণে যা অনেক কমে গিয়েছিল। প্রায় ৬০টি জামাত ছিল। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ৫০ জন সদস্যের জন্য একটি নামাজ কেন্দ্র তৈরি করা। এখন আমরা আবার এ বিষয়ে কাজ শুরু করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ ১৩৭টি কেন্দ্র হয়ে গেছে।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, এর মধ্যে কতগুলো কেন্দ্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোলা থাকে?

এর উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোলা থাকে এমন কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশ মসজিদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোলা থাকে। যেসব মসজিদে মুবাল্লিগ নিয়োজিত আছেন, সেসব মসজিদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোলা থাকে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, সর্বপ্রথম বিষয় হলো প্রত্যেক আহমদির উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়মিত অভ্যাস করা এবং অগ্রাধিকার হওয়া উচিত জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করা। এরপর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তারপর খুতবা। (চলবে....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir